বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব
ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

জ্ঞান ইসলামিকরণ সিরিজ : ২২

আল কুরআন ও মহাবিশ্ব
সমন্বিত ধারায় অধ্যয়ন

প্রফেসর ড. ত্বাহা জাবির আল আলওয়ানী

জ্ঞান ইসলামিকরণ সিরিজ : ২২

আল কুরআন ও মহাবিশ্ব

সমন্বিত ধারায় অধ্যয়ন

প্রফেসর ড. ত্বাহা জাবির আল আলওয়ানী

অনুবাদ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.pathagar.com

আল কুরআন ও মহাবিশ্ব : সমন্বিত ধারায় অধ্যয়ন

লেখক : প্রফেসর ড. ত্বাহা জাবির আল আলওয়ানী

অনুবাদ : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী

ISBN : 978-984-8471-31-9

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন

ঢাকা - ১২৩০

ফোন : ০২-৮৯১৭৫০, ০২-৮৯২৪২৫৬

E-mail : biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com

Website : www.iiitbd.org

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর : ২০১৪

ভাদ্র : ১৪২১

জিলকদ : ১৪৩৫

মূল্য : ৭০.০০ টাকা মাত্র US $ 6

Al-Quran O Mohabishsha Oddayan (Al-Zamiyee Bainal Kiratayen Kiratul Ohee Kiratul Kun) originally written by Prof. Dr. Taha Jabir Al-Alwani. Translate by Prof. Dr. Muhd. Abdur Rahman Anwari. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka - 1230. Phone : 02-8917509, 02-8924256. E-mail: *biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com*, Website : *www.iiitbd.org*, Price : BDT 70.00, US $ 6.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মুসলিম উম্মাহ একটি পাঠ প্রিয় জাতি, পড়ুয়া জাতি। এ জাতি গঠন শুরু হয়েছিল ইকরা বা পড় এ আদেশ দ্বারা। এই উম্মাহ তথা জাতি যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে, তা নি:সন্দেহে মহাজাগতিক, মানবিয় ও বিশ্বজনীন। এ সভ্যতার গোড়া পত্তন করে এবং সৌধ নির্মাণ করে অন্য কেউ নয়, বরং স্বয়ং মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আল কুরআন অবতীর্ণকাল থেকে যুগের পরিধি যতই ব্যপ্ত বা দীর্ঘ হোক না কেন, মানব হৃদয় যতই কঠিন হোক না কেন, যেকোনো সময় এই জাতির সংস্কার ও নতুনভাবে উত্থানের জন্য প্রয়োজন সেই অতীতের মতো পঠন পাঠন তথা অধ্যয়ন করার অভ্যাসে ফিরে যাওয়া।

'আল কুরআন ও মহাবিশ্ব সমন্বিত ধারায় অধ্যয়ন' শীর্ষক এ গ্রন্থে সম্মানিত পাঠকের সামনে প্রফেসর ড. ত্বাহা জাবির আল আলওয়ানী জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) কেন্দ্রিক একটি চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন। দৃষ্টিভঙ্গিটি হলো : আল কুরআনে (প্রথম ওহিতে) নির্দেশিত দু'টি পাঠ তথা অধ্যয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রসঙ্গে। এ দু'ধরনের পাঠের একটি হলো আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত লিখিত গ্রন্থ আল কুরআন পাঠ, অপরটি হলো আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত দৃশ্যমান গ্রন্থ তথা সৃষ্টি জগৎ বা মহাবিশ্ব পাঠ। এ ধরনের স্টাডি বা অধ্যয়ন আল কুরআন ব্যবহার করার নীতিমালার বিষয়টি এবং জীব-জগৎ পরিবেশের সাথে আল কুরআনের মিথষ্ক্রিয়ামূলক ধারণাটিকেও পাঠকদের সামনে বাস্তব করে তুলবে।

এমন সুন্দর একটি গ্রন্থ বাংলা ভাষী পাঠকদের জন্য অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী। তিনি তার পেশাগত কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও অনুবাদের কাজটি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করেছেন বিধায় বিআইআইটি এ প্রয়াসের জন্য তার কাছে ঋণী।

এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের অনুবাদ শেষে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে পেরে বিআইআইটি সত্যিই আনন্দিত। বইটির জ্ঞানতাত্ত্বিক গভীরতা ছাত্র-শিক্ষক-গবেষকসহ তৃতীয় বিশ্বের প্রাগ্রসর বুদ্ধিজীবীদের জ্ঞানতাত্ত্বিক শৃঙ্খলার অন্তর্গত প্রাজ্ঞতাকে বর্ধিত করবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। পুস্তকটি পাঠকমহলে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হলেই কেবল আমাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রকাশনা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.pathagar.com

সূচি

পূর্ব কথা ০৫

ভূমিকা ০৯

আল কুরআন ও মহাবিশ্ব অধ্যয়নের মর্মার্থ ও তাৎপর্য ১৪

দুই ধরনের অধ্যয়নের মাঝে সমন্বয় পদ্ধতি ৩০

জ্ঞান ইসলামিকরণ ও সমন্বয় সাধনের মিশন কুরআনিক ও বিশ্বজনীন ৪১

জ্ঞান ইসলামিকরণ ও মানবজাতির শেষ গন্তব্য ৪৪

www.pathagar.com

পূর্ব কথা

সব প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। দরুদ ও সালাম তাঁর মনোনীত বান্দা নবি রসুল আ. গণের ওপর।

এ গ্রন্থে সম্মানিত পাঠকের সামনে একটি জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology) কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করা হচ্ছে। যে দৃষ্টিভঙ্গিটি হলো : আল কুরআনে (প্রথম ওহিতে) নির্দেশিত দু'টি কিরআত (قرآة) বা পাঠ তথা অধ্যয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রসঙ্গে। এ দু'ধরনের পাঠের একটি হলো আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত লিখিত গ্রন্থ (ওহি তথা আল কুরআন) পাঠ, অপরটি হলো আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত দৃশ্যমান গ্রন্থ (সৃষ্টি জগত তথা মহাবিশ্ব) পাঠ। এ দু'টি পাঠ এখানে সুশৃঙ্খল ভারসাম্যপূর্ণ মানবিয় জ্ঞানের দু'টি মূল উৎস হিসেবে গৃহীত হয়।

আল কুরআনের সর্বপ্রথম ওহি হিসেবে যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তাতে বারবার পাঠ করার নির্দেশ দিয়ে ঐ দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ .
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ .

> পাঠ করুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার প্রভু মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন[১]।

এখানে পাঠ করার জন্য দুইবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। একবার বলা হয়, পাঠ করার জন্য সেই প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়বার বলা হয়, পাঠ করার জন্য সেই প্রভুরই নামে, যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের মাধ্যমে।

এই যে জ্ঞান-দৃষ্টিভঙ্গি বা জ্ঞানতত্ত্ব, যা প্রফেসর ড. ত্বাহা জাবির আল আলওয়ানী পেশ করেছেন, তা ভালো গবেষণার একটি চমৎকার নমুনা স্বরূপ। যে গবেষণা বা

[১] সুরা আলাক ৯৬ : ১-৪ –অনুবাদক।

www.pathagar.com

অধ্যয়নটি একদিকে চিন্তাচেতনা জাগিয়ে তোলে এবং সামগ্রিকভাবে জ্ঞান ইসলামিকরণের জন্য জ্ঞানপদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গিটিকে বাস্তবে রূপ দেয়। অন্যদিকে এ ধরনের স্টাডি বা অধ্যয়ন আল কুরআন ব্যবহার করার নীতিমালার বিষয়টি এবং জীবন জগত পরিবেশের সাথে আল কুরআনের মিথস্ক্রিয়ামূলক ধারণাটিকেও বাস্তব করে তোলে।

এমনিভাবে গ্রন্থটি এক দিকে ইসলামি ঐতিহ্য বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত (জ্ঞান) ভাণ্ডার এবং অন্যদিকে অন্যান্য মানবিয় চিন্তাধারার সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত পদ্ধতিসমূহ থেকে দূরে অবস্থান গ্রহণের দিকটিও বাস্তবিক পন্থায় ব্যাখ্যা করেছে। সে পরিত্যক্ত পদ্ধতিসমূহ হলো :

এক : সব কিছু সাধারণভাবে গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর পদ্ধতিসমূহ

যা (আমাদের) অন্যের (অন্ধ) অনুকরণের দিকে ধাবিত করে। হতে পারে তা অতীতের বিভিন্ন বিষয়াদিতে ডুবে যাওয়া, যা আমাদের বাস্তবতা ও সমস্যা এড়িয়ে গিয়ে শুধু অতীতের সমস্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকার নামান্তর। অথবা ভেড়ার পালের মানসিকতায় পাশ্চাত্য জগত ও তার সংস্কৃতির অন্ধঅনুকরণে লেগে যাওয়া। যা হয় ওহি জ্ঞানের বিকৃত মিশ্র দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ গড়ে তুলছে, নতুবা জীবন ও জগত এবং মানুষ সম্পর্কে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করছে।

দুই : সব কিছু সাধারণভাবে প্রত্যাখ্যান করার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর পদ্ধতিসমূহ।

যা আমাদেরকে সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে বঞ্চিত করার আয়োজন করে। এসব আমাদের একধরনের সাদাসিদে গোঁড়ামি নির্ভর ও বাস্তব বর্জিত ফ্রেমে ঢুকিয়ে দেয়। আর আদল ইনসাফের ধারণা ও আমাদের মাঝে একটি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যে আদল ইনসাফের ব্যাপারে আমরা আদিষ্ট। আল কুরআনে বলা হয় :

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

তোমরা ন্যায়বিচার কর। এটাই তাকওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী[২]।

[২] সুরা মায়িদা : ৮ –অনুবাদক।

www.pathagar.com

তিন : বাছবিচার না করে শুধু অন্ধভাবে নির্বাচন করার দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর পদ্ধতিসমূহ।

যা অবৈজ্ঞানিক পন্থায় কতক বিষয়কে কাছাকাছি করা, তুলনা করা, জোরাতালি দেওয়া, সমঝোতা করা ইত্যাদি প্রক্রিয়া অবলম্বন করার দিকে ধাবিত করে। নিরপেক্ষ চিন্তাভাবনাকারী কোনো ব্যক্তির কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আমাদের হাতে আজ যে গ্রন্থটি রয়েছে, নিঃসন্দেহে এটি ইসলামি জ্ঞান ব্যবস্থা তথা জ্ঞানতত্ত্ব গড়ে তোলা ও পদ্ধতিবিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে একটি সার্থক কর্ম ও অনুসরণীয় মডেল। এ গ্রন্থে পদ্ধতিবিজ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্ন ইশারা ইঙ্গিত ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এসেছে, আল কুরআন ও মহাবিশ্ব অধ্যয়নের মাঝে সমন্বয় সাধনের পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে এবং নতুন নতুন চিন্তাভাবনা পেশ করা হয়েছে। এমনিভাবে কুরআন সুন্নাহ থেকে ঐ পদ্ধতি বিজ্ঞান কিভাবে উপকৃত হতে পারে, এ উভয় উৎসের সাথে কিভাবে সম্পর্ক রক্ষা করতে পারে, আমাদের ইসলামি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানভাণ্ডারসহ অন্যান্য ভাণ্ডারের সাথে এর অবস্থান কী হবে, কিভাবে এ থেকে একটি জ্ঞানগত পদ্ধতি বের করা যায়– এসব বিষয়ের আলোচনা উক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে।

একান্তভাবে আশা করা যায়, এ গ্রন্থটি দ্বারা উম্মাহ উপকৃত হবে। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে চমৎকার লেখালেখির পথে এটি একটি গুণগত পরিবর্তন আনবে এবং সমসাময়িককালের মানস-সংকট ও সংকীর্ণতা থেকে বের হয়ে আসার পথে একটি পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে।

১ রজব, ১৪১৫ হি.

প্রফেসর ড. আলী জুমআ মুহাম্মদ
উসুলে ফিকহ বিভাগ
আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কায়রো

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

মুসলিম উম্মাহ, যার হৃৎপিণ্ড হলো আরব জাতি, তাদের রয়েছে বৈচিত্র্যময় কয়েকটি বৈশিষ্ট্য। তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান ক'টি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

প্রথম বৈশিষ্ট্য

মুসলিম উম্মাহ একটি পাঠক-জাতি, পড়ুয়া জাতি। এ জাতি গঠন শুরু হয়েছিল ইকরা বা পড় (إقرأ) এ আদেশ দ্বারা। এ জাতি গঠনে প্রথমে বলা হয়নি, যুদ্ধ কর কিংবা ঐ জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উঠ। বরং সর্বাগ্রে আদেশ ছিল পাঠ করার জন্য। আর তা নিম্নোক্ত কটি আয়াতে :[৩]

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ .
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ .

পাঠ করুন আপনার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পাঠ করুন, আপনার প্রভু মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না (সুরা আলাক ৯৬ : ১-৫)।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

এই উম্মাহ তথা জাতি যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে, তা হলো মহাজাগতিক, মানবিয় ও বিশ্বজনীন। এ সভ্যতার গোড়াপত্তন করে এবং সৌধ নির্মাণ করে অন্য কেউ নয়, বরং স্বয়ং মহাগ্রন্থ আল কুরআন। আল কুরআন অবতীর্ণকাল থেকে যুগের পরিধি যতই ব্যপ্ত বা দীর্ঘ হোক না কেন, মানব হৃদয় যতই কঠিন হোক না কেন, যেকোনো

---

[৩] এ আয়াত কটির তাফসির অধ্যয়নের জন্য দ্রষ্টব্য : ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাজী, আত তাফসিরুল কবীর, ১৩ খণ্ড, পৃ. ৩২।

www.pathagar.com

সময় এই জাতির সংস্কার ও নতুনভাবে উত্থানের জন্য প্রয়োজন সেই অতীতের মতো পঠন পাঠন তথা অধ্যয়ন করার অভ্যাসে ফিরে যাওয়া।

এই ভাবেই রসুল সা.-এর দায়িত্ব নির্ধারিত হয়েছে মহান আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

তিনিই নিরক্ষরদের মধ্য থেকে একজন রসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাদের কাছে পাঠ করেন তাঁর আয়াতসমূহ, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং শিক্ষা দেন কিতাব ও হিকমত। ইতঃপূর্বে তারা ছিল ঘোর পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত (সুরা জুমআ ৬২ : ২)।

অতীতে হজরত ইবরাহীম আ. এই দোয়াই করেছিলেন, যা আল কুরআনে এসেছে নিম্নোক্তভাবে :

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

হে আল্লাহ তায়ালা! তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন, যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করবেন, তাদের কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা (সুরা বাক্বারা ২ : ১২৯)।

মু'মিন বান্দাদের ওপর বিশেষ অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন -

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

আল্লাহ তায়ালা ইমানদারদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবি পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে

www.pathagar.com

কিতাব ও কৌশলের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১৬৪)।

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ـ رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ.

হে বুদ্ধিমানগণ, যারা ইমান এনেছ, তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের প্রতি উপদেশ (কিতাব) নাজিল করেছেন। একজন রসুল (পাঠিয়েছেন), যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহ তায়ালার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করেন, যাতে ইমানদার ও সৎকর্ম পরায়ণদের অন্ধকার থেকে আলোতে আনায়ন করেন (সুরা তালাক ৬৫ : ১০-১১)।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ . رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً

আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা (কুফুরি থেকে) প্রত্যাবর্তন করত না, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার একজন রসুল, যিনি আবৃতি করতেন পবিত্র সহিফা (সুরা বাইয়্যেনা ৯৮ : ১-২)

আর বাধ্যকরণ ও অযাচিত কর্তৃত্ব চর্চা করা নবি সা.-এর নবুয়তের বৈশিষ্ট্য বিরোধী বলে আল কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে এভাবে :

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ

আপনি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নন (সুরা গাশিয়া ৮৮ : ২২)।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

www.pathagar.com

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ

আপনি তাদের ওপর জবরদস্তিকারী নন (সুরা ক্বাফ ৫০ : ২৬১)।

নবি সা. কে এরূপ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, যেন তার মাধ্যমে মানবসমাজে সত্য দ্বীন-সঠিক পথ প্রদর্শনকারী দ্বীনকে বিজয়ী করেন। ফলে সারা বিশ্বে হেদায়েতের বাণী ও শান্তি বিরাজ করবে। আর মানবজাতি সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করবে।

আর নবি সা.-এর রেসালাতের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ :

সার্বজনীনতা, ব্যাপকতা, আন্তর্জাতিকতা, রাব্বানিয়্যাত, ভারসাম্যপূর্ণ ও জ্ঞান-পদ্ধতি বিজ্ঞান বা ম্যাথডোলজি (Mathodology of Knowledge)।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

এই উম্মাহ তথা মুসলিম জাতি নবুয়তী ধারার সকল উত্তরাধিকার হেফাজতকারী ও আমানতদার। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ . ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

আমি তোমার প্রতি যে কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা সত্য, ইহা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের সব কিছু জানেন ও দেখেন। অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করেছি তাদেরকে, যাদেরকে আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছি। তাদের কেউ কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশক্রমে কল্যাণের পথে এগিয়ে গেছে। এটাই মহা অনুগ্রহ (সুরা ফাতির ৩৫ : ৩১-৩২)।

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য

তা হলো তাদের রয়েছে নির্ভেজাল তাওহিদ। এ একনিষ্ঠ পরিচ্ছন্ন তাওহিদের ভিত্তিতে মুসলিম জাতি অন্যান্য জাতি থেকে স্বতন্ত্র। এ তাওহিদের বিভিন্ন দিক

www.pathagar.com

হলো : তাওহিদুল উলুহিয়্যা (ইবাদত পাওয়ার দিক দিয়ে আল্লাহ তায়ালার এককত্ব), তাওহিদুল রুবুবিয়্যা (রব হিসেবে এককত্ব), তাওহিদুস সিফাত (গুণাগুণের ক্ষেত্রে এককত্ব)। সব নবি তাওহিদের এ ব্যাপক ধারণা প্রদান করেছেন। ব্যাপকার্থে ইসলাম হলো দ্বীনে তাওহিদ। যা সব নবি-রসুল সা.-এর দ্বীন। যুগে যুগে যদিও বিভিন্ন পরিবর্তন ও বিচ্যুতি ঘটানো হয়েছে নবিগণের রেসালত ও বিশুদ্ধ ধর্মীয় চিন্তাধারায়; তবু আল্লাহ তায়ালা ইসলামি আক্বিদা ও তার মূলনীতিতে সেই তাওহিদী উত্তরাধিকারকে সংরক্ষণ করছেন নিজ দায়িত্বেই। যে উত্তরাধিকারের মৌলিক দিকগুলো উপস্থাপন করেছেন তাঁর শাশ্বত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহিমান্বিত গ্রন্থ আল কুরআনে। যে গ্রন্থ কোনোভাবেই কোনো ভ্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেনি। তাওহিদের মৌলিক দিকগুলো এ চিরন্তন গ্রন্থে এ জন্য প্রতিস্থাপন করা হয়, যাতে এ তাওহিদ একটি মানদণ্ড হিসেবে অবস্থান করে, যা উলুহিয়্যাত (ইলাহ হওয়া) ও উবুদিয়্যাত (দাসত্ব বা আনুগত্য মেনে নেয়া) এর মাঝে সীমা নির্ধারণ করে দিতে সক্ষম হয়। উলুহিয়্যাত তার সব বৈশিষ্ট্যসহ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্দিষ্ট। আর উবুদিয়্যাত তথা বন্দেগীপনা হলো মানুষের বিচরণক্ষেত্র, যা সেই উলুহিয়্যাতের কোনো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী না হওয়া বুঝায়। যেন তারা সবাই একমাত্র আল্লাহ তায়ালার বান্দাহ হয়ে যেতে পারে। তাঁর কাছে সব কিছুতে সকলে সমান। অন্য সব কিছুর প্রভাব থেকে তাদের মন ও চিন্তনশক্তি মুক্ত থাকবে। এভাবেই তারা অনুধাবন করতে পারবে, এ জগতে তারা মূলত একটি দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রতিনিধিস্বরূপ তথা খেলাফত প্রাপ্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞান, পরিকল্পনা-পদ্ধতি, স্থিতিশীলতা, ভারসাম্য, ন্যায়বিচার, আমানত, শরিয়াহ এবং সর্বোপরি ওহিজ্ঞান ও বিশ্বজগতের সার্বক্ষণিক অধ্যয়ন ব্যতীত সে দায়িত্ব পালন সম্পন্ন হবে না[৪]।

---

৪ এ ধরনের আরো অনেক দিক রয়েছে। পড়ার জন্য অনেক গ্রন্থ ও গবেষণা রয়েছে। যা আকিদা ও ইমানের বিভিন্ন উপাদানসমূহ আলোচনা করেছে। যেসব উপাদান মুসলিম চিন্তাধারা তৈরির ভিত্তিস্বরূপ। মহাবিশ্ব, জীবন ও মানুষ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণার জন্যও ঐ সব উপাদান হলো মূলভিত্তি। এসব আকিদা ও চিন্তাধারাকি সম্পর্কে যেসব গ্রন্থ আলোচনা করেছে, তন্মধ্যে অগ্রগণ্য যোগ্য কটি হলো : মুহাম্মদ আবদুহু রচিত রিসালাতুত তাওহীদ (رسالة التوحيد), রশীদ রেদা রচিত আল ওহি আল মুহাম্মদী (الوحي المحمدي), শায়খ মুহাম্মদ মুবারক রচিত 'নিযামুল ইসলাম আল আল আকাইদী (نظام الإسلام العقائدي), উস্তাদ হাসানুল বান্না রচিত আল আকাইদ (العقائد), শায়খ মুহাম্মদ আল গাজ্জালী রচিত আকিদাতুল মুসলিম (عقيدة المسلم), শায়খ আল জাসার রচিত কিসসাতুল ইমান (قصة الإيمان), উস্তাদ সায়্যিদ কুতুব রচিত আল আদালাতুল

www.pathagar.com

আল কুরআন ও মহাবিশ্ব অধ্যয়নের মর্মার্থ ও তাৎপর্য [৫]

ইজতিমাইয়্যা (العدالة الاجتماعية), ড. হাসান আল লাহিয়াভী রচিত আত তাসাওওরুল ইসলামি লিল ওজুদ (التصور الإسلامي للوجود) ইত্যাদি।

[৫] দুই কিরআত বা পাঠ বা অধ্যয়ন বলতে বুঝায় : ওহি অধ্যয়ন ও মহাবিশ্ব অধ্যয়ন। উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনজনিত চিন্তাধারা বা প্রত্যয়টি আল হারিছ আল মুহাসিবী রচিত আল আকল ওয়া ফাহমুল ওহি নামক গ্রন্থে কিছুটা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। সে গ্রন্থে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আল কুরআন বুঝতে হলে মহাবিশ্ব বা জগত বুঝতে হবে। এমনিভাবে ইমাম রাজী অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তার রচিত মাফার্তিহুল গায়ব (مفاتيح الغيب) নামক তাফসিরটির ভিত্তি রচনা করেন এ দৃষ্টিকোণের ওপর। তিনি তার তাফসিরে প্রাকৃতিক বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা সন্নিবেশ করেছেন। বিশেষত : জ্যোতির্বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, আত্মা, নাকলি বা বর্ণিত জ্ঞান ও আকলি বা বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করা যায়। ঐ সমন্বয়ধর্মী চিন্তাধারা থেকেই তিনি এসব আলোচনা করেছেন। মনে হয় যেন তিনি অনবরত তাকিদ করেছেন, মানুষ যেসব জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে জেনেছে, তা আল কুরআন থেকেই বের করে জেনেছে এবং সে বিজ্ঞান দ্বারাই তারা আল কুরআনও বুঝেছে। তার তাফসিরটির বিভিন্ন স্থান বিশেষত এর ভূমিকাংশ পাঠ করলে এ দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। বরং শুধু এতটুকুই নয়, তিনি আরো অগ্রসর হয়ে আল কুরআনের সাথে জ্ঞান বিজ্ঞানকে সম্পর্কিত করে এগুলো তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। প্রথমত এমন বিদ্যা যা আল কুরআন থেকে বের করা। দ্বিতীয়ত এমন বিদ্যা, যা দ্বারা আল কুরআন বুঝা যায়, তাফসির করা হয়। তৃতীয়ত এমন বিদ্যা, যা কোনো না কোনোভাবে ঐ সব বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত। শায়খ ইবন আত্তর রচিত তাফসিরুত তানবীর নামক তাফসিরটিও এ ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। এ বিষয়টির ওপর আরো অনেক আলেম গুরুত্বারোপ করেছেন।

কিন্তু সমসাময়িক গবেষকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যিনি শ্রম দিয়েছেন, আমাদের যুগে ঐ চিন্তা ধারার নির্যাস বের করেছেন এবং একে কয়েকটি পর্যায়ভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন, তিনি হলেন প্রফেসর মুহাম্মদ আবুল কাসেম হাজ হামাদ। উপরিউক্ত বিষয়টি তিনি তার তিনটি গ্রন্থে আলোচনা নিয়ে এসেছেন। গ্রন্থ তিনটি হলো :

১. আল আলামিয়্যা আল ইসলামিয়া আছ ছানিয়া (العالمية الإسلامية الثانية), (১৯৭৯ সালে বৈরুতের দারুল মাসিরা থেকে প্রকাশিত)

২. আজামাতুল ফিকরিয়া ফি ওয়াকিয়িল আরাবী আল রাহিন (الأزمة الفكرية في الواقع العربي الراهن)

৩. মানহাজিয়াতুল কুরআন আল মারাফিয়া (منهجية القرآن المعرفية)।

বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যে সব মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় তা বাদ দিলে দুই ধরনের পাঠ বা অধ্যয়ন অর্থাৎ ওহিজ্ঞান অধ্যয়ন ও মহাবিশ্বের অধ্যয়নের মাঝে সমন্বয় সাধনের বিষয়টিকে জ্ঞান ইসলামিকরণ চিন্তাভাবনা চালানোর পথের সূচনা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। যে

www.pathagar.com

আল-কুরআনে পাঠ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা যে নির্দেশ এসেছে, সে পাঠ করার মাইলফলকসমূহ নির্ধারিত এবং এর লক্ষ্যও স্পষ্ট। পাঠ করার ঐ নির্দেশটি দুইবার এসেছে।

প্রথম পাঠ

পাঠ করার জন্য প্রথম নির্দেশটি ছিল, আল্লাহ তায়ালার নামে পাঠ করার জন্য। তখন এ নির্দেশটি ছিল, সেই অবতীর্ণ ওহিজ্ঞান পাঠ করতে। আল্লাহ তায়ালার ফয়সালা অনুসারে, এ ওহি অবারিতভাবে নাজিল হতে হতে মহান গ্রন্থ কুরআন কারিমে রূপ নেয়। যে গ্রন্থের আয়াতগুলো বিশদভাবে সুবিন্যস্ত। যে জন্য তাঁর নবি সা.-এর জন্য নির্দেশ ছিল, হে মুহাম্মদ সা.! তা আপনি মানুষের নিকট তেলাওয়াত করুন। তাদের নিকট ব্যাখ্যা করুন। যাতে তারা এ থেকে শিক্ষা নেবে হিকমাহ, অর্জন করবে হেদায়েত ও সঠিক দিকনির্দেশনা। অতঃপর পূত-পবিত্র হবে তাদের

ইসলামিকরণের পলিসি ও তৎপরতার ওপর ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে স্পষ্ট ম্যাথডোলজি ছিল উভয় ধরনের অধ্যয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। সে দিনকার মুসলমানদের শক্তির উৎস এই ছিল যে, তারা ওহিজ্ঞান ও বাস্তবতার মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করেছিলেন। এ পদ্ধতি অনুসরণের কারণে তারা ওহিজ্ঞানের ভাষ্য নিরাপদেই অনুধাবন করেছিলেন। যে জন্য বিশ্বে এক উন্নত সভ্যতার সৌধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু যখন উভয়ের মাঝে মধ্যস্থতাকারী অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানগুলো জন্ম নিলো, তখন সে গুলো ওহিজ্ঞানের ভাষ্য ও মুসলিম মানসের মাঝে দেয়াল তৈরি করল। সুতরাং সালাফে সালেহীনের (পূর্ববর্তী পুণ্যবানজ্ঞানীদের) দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, ইসলামি সভ্যতার নিরাপদ ভিত্তি ছিল, উভয় ধরনের অধ্যয়নের মাঝে সমন্বয় সাধনকেন্দ্রিক ম্যাথডোলজি বা জ্ঞান-গবেষণা পদ্ধতি বিজ্ঞান অনুসরণ। যে ম্যাথডোলজিটি হলো : সঠিক পথ অনুসারী মুসলিম মানস, পবিত্র ওহিজ্ঞান ও পরিবর্তনশীল পরিবেশের মাঝে মিথস্ক্রিয়া ঘটানো। যার ভিত্তিতে ওহিজ্ঞান বুঝা ও অনুধাবন করা, একে বাস্তবতার সাথে সংযোগ করা এবং এর মূল্যবোধের আলোকে জীবনের দিকনির্দেশনা দান করা। এসব হলো ইসলামি সভ্যতার মূলভিত্তি। আর ওহিজ্ঞান ও মহাবিশ্ব অধ্যয়নের মাঝে যখনই মধ্যস্থতাকারী কিংবা পরস্পর মুখোমুখি শরয়ী ভাষ্য বিদ্যার জন্ম হলো, যে সবের মাঝে মুসলিম মানস নিবিষ্ট হয়ে গেল এবং আল কুরআনের ভাষ্য বা মহাবিশ্ব ও তার বিভিন্ন বিষয়াদি থেকে তাদের মনোযোগ উঠে গেল, তখন উভয় ধরনের অধ্যয়নের মাঝে সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়াটি নষ্ট হয়ে গেল। এভাবেই শরয়ী নস তথা ওহিজ্ঞানের ভাষ্য ও বাস্তবতার মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। আর এ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

প্রবৃত্তি, পরিচ্ছন্ন হবে তাদের জীবন। পথ খুঁজে পাবে সেই খেলাফতের দায়িত্ব পালন করতে, আমানত বহন করতে এবং সভ্যতা গড়ে তোলার কর্তব্য সম্পাদনে।

প্রথম ওহি নাজিল হওয়ার প্রাক্কালে যখন নবি সা. কে বলা হলো, পড়ুন। আর তখন তিনি বললেন যে, তিনি পড়তে জানেন না। নিঃসন্দেহে তিনি পড়া প্রত্যয়টি দ্বারা বুঝে ছিলেন, যা তার জন্য লিখে দেয়া হচ্ছে তা পড়ার জন্য। অথচ তিনি লেখাপড়া জানেন না। আর যা পড়তে হবে, সে সম্পর্কেও তার জানা নেই। কিন্তু এপর্যায়ে আল্লাহ তায়ালা তখন পাঠ করার বিষয়টিকে মিশিয়ে দেন আরেকটি বিষয়ের সাথে। তা হলো : পড়ুন আপনার প্রভুর নামে। আল্লাহ তায়ালার নামে পড়তে বলা হয়। হয়তো তিনি তাকে বলেছিলেন : আপনি যা জানেন না, এমন কাজ সম্পাদনে আপনি একা নন। বরং আপনার সাথে আপনার রবও রয়েছেন। যিনি আপনাকে অনেক দিয়েছেন। তিনি আপনাকে যে বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছেন তা সম্পাদনের পন্থাও শিক্ষা দিতে সক্ষম। অধিকন্তু তিনিই আদম আ. কে সমস্ত বস্তু সামগ্রীর নাম শিক্ষা দিয়েছেন। আর যেমনিভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন ইবরাহীম, মুসা, ঈসা ও অন্যান্য নবি রসুলগণকে। অতএব, পড়ার জন্য আপনি তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করুন। তিনি আপনাকে সহযোগিতা করবেন। তিনি আপনার সাথে থেকে পড়ার ক্ষেত্রে, ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে, এসব শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে এবং এর দ্বারা মানবসমাজের ওপর (আখেরাতে জিজ্ঞাসা করার) দলিল-প্রমাণ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবেন।

আল্লাহ তায়ালা ঐ প্রথম ওহির মধ্যে মানুষ (الإنسان) বিষয়ক আলোচনার অবতারণা করেন। এখানে পড়ার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে স্বয়ং মানুষ সৃষ্টি করার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন। যাতে রসুল সা. আশ্বস্ত হন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পাঠ করার সামর্থ্য দান করবেন। যে প্রভু সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, জমাট রক্ত পিণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তার পক্ষে পড়ার সামর্থ্য প্রদান করার দিকটা তেমন কঠিন বিষয় নয়।

দ্বিতীয় পাঠ

এমনিভাবে (মানুষ) সৃষ্টি করা'র প্রসঙ্গটি উল্লেখ করার ফলে নবি সা.-এর বুদ্ধিদীপ্ত মানস ও পবিত্র সত্তাও প্রস্তুতি নিয়ে নেয় দ্বিতীয় প্রকারের পাঠ করার জন্য। তা হলো সৃষ্টি জগত পাঠ করা ও অধ্যয়ন করা।

www.pathagar.com

এভাবে দুই ধরনের গ্রন্থ পাঠ করা ওয়াজিব হয়েছে। একটি হলো আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী গ্রন্থ আল কুরআন। অন্য গ্রন্থটি হলো মহাবিশ্ব জগত। যা উন্মুক্ত। মানবসমাজসহ গোটা সৃষ্টিজগত এর আওতাভুক্ত।

আর এ দুই ধরনের অধ্যয়ন একই সাথে করা প্রয়োজন। যেন পূর্ণাঙ্গরূপে সভ্যতা জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে মানবসমাজ খেলাফতের মহান দায়িত্ব ও আমানত বহন করতে সক্ষম হবে। সভ্যতা গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হবে।

ঐ সভ্যতা– জ্ঞান অর্জন করার বিষয়টি শুধু অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করার প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং আরো কিছু করতে হবে। তা হলো অন্যের কাছ থেকে গ্রহণ করতে গিয়ে সমালোচনা পর্যালোচনা করা, অধ্যয়ন করা, বই পুস্তক পড়া, বই পুস্তক লেখা, মানুষের মাঝে জ্ঞান-বিজ্ঞান অভিজ্ঞতা বিনিময় করা এবং কলম তথা লেখনীর ব্যবহার করা। যে কলমের দ্বারা আল্লাহ তায়ালা শিক্ষা দিয়েছেন, একে জ্ঞানের আদান-প্রদান, উন্নয়ন ও স্থানান্তরের মাধ্যম হিসেবে নিয়োজিত করেছেন। অনন্তর আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহবশত এমন অনেক জ্ঞান শিক্ষা দেন, যা উদ্ভাবন ও আবিষ্কার ইত্যাদি করতে আকল বা মানবিয় বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্য ত্রুটিবিচ্যুতি করে থাকে। এ ধরনের অজানা বিষয়ের উল্লেখ করা হয় নিম্নোক্ত আয়াতে :

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

মানুষ যা জানত না, তিনি তাই শিক্ষা দিয়েছেন।

সুতরাং মানুষের জ্ঞানার্জনের জন্য ওহি ও মহাজাগতিক–এ দুই ধরনের উৎস রয়েছে। উভয়ের মিলিত ধারা মানুষকে দৃশ্যমান জগত সভ্যতার জ্ঞানের কাছে পৌছে দেয়। এ বিশ্ব চরাচরে সভ্যতা গড়া ও খেলাফতের দায়িত্ব পালনে মানুষকে সামর্থ্য করে তুলে।

সুতরাং উভয়ের মাঝে সমন্বয় প্রয়োজন। তখন সৃষ্টিজগতের মাধ্যমে মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও তার মর্মার্থগুলো অনুধাবন করা যাবে। তেমনিভাবে মহিমান্বিত কিতাব আল কুরআন ও তার হেদায়েতের জ্যোতির মাধ্যমে জগত কী? তাও বুঝা যাবে। এ জগতে খেলাফতের দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে, তাও জানা যাবে। কিভাবে ঐ আমানতের দাবি পূরণ করা হবে, তাও জানা যাবে।

www.pathagar.com

অতএব, দুই ধরনের উৎসই অধ্যয়ন করতে হবে। দুই ধরনের পাঠ সমন্বয় করার প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়ন করতে হবে। দুই ধরনের পাঠ করার একটি হলো অবতীর্ণ ওহি পাঠ করা, যা একটি মহাগ্রন্থে রূপ লাভ করেছে। যে মহান গ্রন্থ সত্যের আধার আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি কর্মের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টভাবে বলে দিয়েছে, সৃষ্টি জগত নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মকানুন সম্পর্কে সতর্ক করেছে, জীবন পথ ও পরিকল্পনা, বিধান এবং মৌলিক তত্ত্বাদি বিশ্লেষণ করেছে।

অপর পাঠ করার ধরন হলো মহাবিশ্ব পাঠ করা। এ পাঠ করার ক্ষেত্রে যেসব দিক আওতাভুক্ত করে, তা হলো : মহান আল্লাহ তায়ালার কুদরতের নিদর্শনগুলো, তাঁর গুণাবলি, মানব সৃষ্টি-কর্ম ও মহাবিশ্ব পরিবেশের সব কিছু অধ্যয়ন। এমনিভাবে এ জগত সৃষ্টি ও প্রতিপালনে মহান আল্লাহ তায়ালার কার্যাদি পর্যবেক্ষণ করা। একইভাবে মানব সৃষ্টি করে তাদেরকে এ জগতে খেলাফতের আমানত প্রদান, একে তাদের দ্বারা আবাদ করা, একে তাদের অধীন ও অনুগত করে দেয়ার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ তায়ালার কিরূপ পরম দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, তাও পর্যবেক্ষণ করা।

সুরক্ষিত মহাগ্রন্থ আল কুরআন, তার আয়াতগুলো ও তৎসংশ্লিষ্ট দিকনির্দেশনা দ্বারা অতীতে তথা তার নাজিল হওয়ার যুগে মানুষের জ্ঞানগত সংকট নিরসনে অত্যন্ত সফল সমাধান পেশ করে। যে সঙ্কটটি কখনো পরিচিত হয় জাহেলিয়াত তথা অজ্ঞতা হিসেবে, আবার কখনো জুলুমাত তথা অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে।

একমাত্র সেই মহাগ্রন্থ যুগ যুগ ধরে এবং এখনো সমসাময়িক জ্ঞান জগতের সঙ্কট নিরসনে তথা খ্রিষ্টিয় বিংশ শতাব্দীর জাহেলিয়াত অপসারণের চাবিকাঠি পেশ করতে সক্ষম।

এ দুই ধরনের অধ্যয়ন ক্রিয়ার মাঝে সমন্বয় সাধন করা, মানব তৈরিকৃত কলমকে এর নির্বুদ্ধিতা ও বিদ্রোহের গণ্ডি থেকে বের করে আনা এবং ওহিলব্ধ জ্ঞান অধ্যয়নের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বাস্তববাদ (Realism) অনুসারীদের লুণ্ঠিত বৌদ্ধিক পরিমণ্ডল থেকে অবমুক্ত করা যাবে।

ওহিলব্ধ জ্ঞান অধ্যয়নের সাথে যে কলমের সম্পর্ক রয়েছে, সে কলমের ব্যাপারে আল কুরআনে বলা হয় :

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ . مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ

www.pathagar.com

নূন, শপথ কলমের এবং এর দ্বারা তারা যা লিখে তার। আপনার প্রভুর নিয়ামতে আপনি পাগল নন (সুরা কলম ৬৮ : ১-২)।

ওহিলব্ধ জ্ঞান লুণ্ঠিত অবস্থা থেকে অবমুক্ত করা হলে দেখা যাবে মৌলিক জ্ঞানের উৎস দয়াময় আল্লাহ তায়ালা। আল কুরআনের ভাষায় তাঁর পরিচয় :

عَلَّمَ الْقُرْآنَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ . عَلَّمَهُ الْبَيَانَ যিনি শিক্ষা দিয়েছেন আল কুরআন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনিই তাকে শিক্ষা দিয়েছেন বিশ্লেষণ বা ভাব প্রকাশ করার কৌশল (সুরা আর রহমান ৫৫ : ২-৪)।

এভাবে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিজগতে মিজান তথা মানদণ্ড বা ভারসাম্য স্থাপন করেছেন এবং আপনাদের কাছে আমানত রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ . وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

তোমরা মানদণ্ড (ভারসাম্য) লঙ্ঘন করো না। ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর। ওজনে এ মান নষ্ট করো না (সুরা আর রহমান ৫৫ : ৮-৯)

অন্যত্র আরো বলা হয় :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

আর আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর (সুরা নাহল ১৬ : ৭৮)।

একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইলম হলো ব্যাপক, পূর্ণাঙ্গ ও সার্বিক। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয় :

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

www.pathagar.com

দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমাকে তারা কোন কিছু দিয়েই পরিবেষ্টিত করতে পারবে না। কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়। তিনিই সর্বোচ্চ এবং সর্বাপেক্ষা মহান (সুরা বাকারা ২ : ২৫৫)।

আল কুরআনের ভাষায় :

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

জ্ঞানে আল্লাহ তায়ালা সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন (সুরা তালাক ৬৫ : ১২)।

আর মানুষের মধ্যে অনেকেই অনেক কিছু জানে না। কোন বিষয়ে কিছু জানলেও তা বাহ্য জ্ঞান। ইরশাদ হয়েছে :

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্বন্ধে অবগত, আর আখিরাত সম্বন্ধে এরা গাফিল (সুরা রূম ৩০ : ৭)।

এপর্যায়ে বলা যায়, বর্তমান বিশ্বের জ্ঞানগত সঙ্কট থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো কুরআনের জ্ঞান- পদ্ধতি। মুহাম্মদ সা.-এরপর আর কোনো নবি নয়। আল কুরআনের পর আর কোনো আসমানী কিতাব নয়। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا . فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

আমি ইচ্ছা করলে প্রতিটি জনপদে একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম। সুতরাং আপনি কাফেরদের আনুগত্য করবেন না। আর আপনি কুরআনের সাহায্যে তাদের সঙ্গে প্রবল সংগ্রাম চালিয়ে যান (সুরা ফুরকান ২৫ : ৫১-৫২)।

আল-কুরআন পাঠ বা অধ্যয়ন আর মহাবিশ্ব অধ্যয়ন উভয়টিই ফরজ। কারণ উভয়টির জন্যই আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ রয়েছে। আর উভয়টির মাঝে সমন্বয় করাও জরুরি। কেননা এ সমন্বয় না করলে অধ্যয়ন প্রক্রিয়ায় ত্রুটি দেখা দেবে, শূন্যতা থেকে যাবে।

www.pathagar.com

প্রথম পাঠ উপেক্ষার ফলাফল

যে ব্যক্তি প্রথম পাঠ উপেক্ষা করবে এবং শুধুমাত্র দ্বিতীয় পাঠ তথা মহাবিশ্ব সংক্রান্ত জ্ঞান বা জাগতিক অধিবিদ্যা অধ্যয়নে নিমগ্ন হয়ে যাবে, সে আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, অদৃশ্য জগত সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এমনিভাবে সে বাস্তববাদ (Realism) নামে একটি ফসলহীন পানিশূন্য দর্শন নিয়ে পথ চলবে। যে দর্শনের প্রবাহ বা ধারাসমূহ মানুষ ও প্রকৃতি জগতের মাঝে সম্পর্ক নির্ণয়ে এবং উভয়ের মাঝে ঐক্যতান বিধানে ব্যর্থ। যে দর্শন সৃষ্টিকর্তা ও অদৃশ্য জগতের সব কিছুকে অদৃশ্য বা অতিন্দ্রিয় বলে উড়িয়ে দেয়। এ দর্শনের মতে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে অদৃশ্য কোন শক্তি, যদি থেকে থাকে, তা হলো তার ভূমিকা শুধু প্রথমবার সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে। অতঃপর সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টি জগত সম্পর্কে ভুলে যাওয়ার মতো অবস্থানে আছেন কিংবা ভুলে গিয়েছেন। তিনি সব কিছুকে ছেড়ে দিয়েছেন নিজের মতো চলার জন্য। যেন তারপর প্রকৃতি জগত যন্ত্রের মতো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় চলমান থাকে।

অতীতে এ দর্শনের প্রবক্তা ছিলেন এরিস্টটল, আর আধুনিককালে নিউটন ও অন্যা ব্যক্তিরা।

এ ধরনের দার্শনিকদের মধ্যে যখন কেউ মজা করে সৃষ্টিকর্তার নাম উল্লেখ করতে চান, তখন তিনি বলেন, সৃষ্টিকর্তা প্রাকৃতিক শক্তির সাথে মিশে গিয়েছেন। তিনি এর মাঝে হারিয়ে গিয়েছেন। তার বিভিন্ন অংশে অবস্থান করে তিনি বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

এভাবে এ ধরনের দার্শনিকগণ দ্বান্দিক বস্তুবাদ-এর জন্ম দিয়েছেন। যে মতবাদ সৃষ্টিকর্তাকে পুরাপুরিভাবেই অস্বীকার করে বসেছে। তার বিকল্প হিসেবে বস্তুগত জটিল বিবর্তনমূলক এমন সব চিন্তাধারা উপস্থাপন করছে, যার মধ্যে অবগাহন করে মানুষ নিজেকে একটি স্বাভাবিক সৃষ্টবস্তুর মতোই মনে করে।

আর এখানেই মানুষ নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি অমুখাপেক্ষী হিসেবে মনে করতে শুরু করে। কেননা তার সামনে বস্তু জগত ছাড়া সে আর কিছু দেখছে না। দৃশমান প্রকৃতি জগতই সব। তার আড়ালে আর কিছু নেই। এ মানুষ স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতি জগতকে বশ মানাতে সক্ষম। তখন সে এটা মনে করে না যে, এ সৃষ্টি জগত আল্লাহ তায়ালার নিয়মানুসারেই মানুষের অনুগত ও সেবক। বরং

www.pathagar.com

সে মনে করে যে, এ জগত কোনো গায়েবি তথা অদৃশ্য শক্তির মদদ ছাড়াই স্বয়ং সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল হতে পারে। এভাবে সে মানুষ অনুভব করে না যে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য প্রকৃতি জগতকে অনুগত করে দিয়েছেন। তিনিই মানুষ ও মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। বরং সে মানুষ মনে করে যে, সে যা করছে, তা সে নিজেই করছে। নিজেই আবিষ্কারক, বৈচিত্র্যময় শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী, প্রকৃতি জগতের ওপর কর্তৃত্ব চর্চাকারী, এ মহাজগতের ভাণ্ডার উন্মোচনকারী।

বস্তুত মানুষের জন্য মহা সৃষ্টিজগতকে প্রস্তুত করা হয়েছে। সব কিছু তাদের অনুগত করে দেয়া হয়েছে। মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ও জ্ঞানগত দিক দিয়ে তাকে বৈচিত্র্যময় শক্তি প্রদান করা হয়েছে, যা তাকে সৃষ্টি জগতকে অনুগত করতে সামর্থ্যবান করে তুলেছে। যেন এর দ্বারা খেলাফতের আমানত বহন করতে পারে। মানুষ যখন দয়াময় প্রভু থেকে গাফেল হয়ে যায়। তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং ওহিজ্ঞানের ধারায় বর্ণিত ওই সব ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার শক্তি কার্যকর বলে মনে না করে, তখন তার অন্তরে একটি অনুভূতি বদ্ধমূল হয়ে যায়। যে অমুখাপেক্ষী স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিজেকে শক্তি সামর্থ্যবান ও সৃজনকর্তা হিসেবে মনে করে।

এভাবে প্রকৃতি জগতের সাথে সে তার যে সম্পর্ক কল্পনা করে বসে, তা হলো : সে প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্বকারী, নিয়ন্ত্রণকারী, জবরদস্তিকারী ও প্রকৃতির সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এভাবে প্রকৃতির সাথে তার সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় কর্তৃত্ব চর্চা, জবরদস্তীকরণমূলক ও দ্বান্দ্বিক। এ পর্যায়ে মানুষের সাথে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চেতনা হারিয়ে যায়। তখন আর এটা মনে হয় না যে, সৃষ্টজীব মানুষ জগতে খলিফা বা প্রতিনিধি, আমানতদার এবং প্রকৃতি জগত সেই আমানতদার খলিফার জন্য সেবক, উপকারী। এসব মানুষ মনে করে না যে, তারা ও মহাজগত উভয়ে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট হওয়া এবং বান্দাহ হওয়ার ক্ষেত্রে সমান। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন :

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

> আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এবং তোমাদের কর্মকে সৃষ্টি করেছেন (সুরা আস সাফফাত : ৯৬)।

জগতের অন্যান্য সৃষ্টির সাথে মানুষের এ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে বলে যারা মনে করে না, তারা এ অস্তিত্বশীল মহাবিশ্বকে দ্বন্দ্ব বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন শক্তির আধার রূপেই ধরে নেয়। আর এ অমনোযোগী মানুষ নিজেকে ইলাহ রূপেই গণ্য করে। যে তার

www.pathagar.com

জ্ঞান বলে কর্তৃত্ব করছে। তখন নিজের স্তুতি গাইতে থাকে এবং নিজের প্রকৃতিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে এবং বস্তুভিত্তিক তার মূল্যবোধ তৈরি করে। তার কাছে ধর্মসমূহ হয়ে দাঁড়ায় এমন বস্তু, যাকে বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। বিশেষ সমস্যা সমাধানে কারো আগ্রহে কিংবা কোনো সেবা বা উপকারে ধর্মকে ব্যবহার করা যায় মাত্র। এর প্রতিবাদে আল কুরআনে বলা হয় :

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى . أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى

বস্তুত : মানুষ অবশ্য সীমালঙ্ঘন করেই থাকে, কারণ সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে (সুরা আলাক ৯৬ : ৬-৭)।

এ অবস্থায় মানুষ স্বেচ্ছাচারিতা ও সীমালঙ্ঘন করার প্রবণতায় পতিত হয়।[৬] পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে। জলে স্থলে ও মহাশূন্যে ফ্যাসাদ ও দূষণ দেখা দেয়, যা মানুষের হাতেই সৃষ্ট। এমনিভাবে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। এ বসুন্ধরায় দেখা দেয় বিচ্যুতি ও পুংমৈথুনের মত ব্যতিক্রমধর্মী বিরলপ্রকৃতির রোগব্যাধি। ফলে কোনো মহাদেশে ক্ষুধা ও ধ্বংসলীলা ব্যাপকতা লাভ করছে। কোনো মহাদেশে সব ধরনের রোগব্যাধি, অপরাধ ব্যাপক বিস্তার ঘটছে। আর এভাবে কষ্টকর সংকটপন্ন জীবনযাত্রা বিরাজমান করছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

যে আমাকে স্মরণ করতে বিমুখ তার জীবন যাপন হবে সঙ্কুচিত এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব (সুরা ত্বোয়া-হা : ১২৪)।

পরম আল্লাহ তায়ালা থেকে বিমুখরা হয়তো কখনো কখনো আত্মতুষ্টিতে থাকেন যে, প্রকৃতিতে যা কিছু ঘটছে, তা তার জন্য অনিবার্য প্রাকৃতিক ট্যাক্স। যারা সভ্যতার দান ভোগ করতে চান এ অনিবার্য ট্যাক্স থেকে তাদের গত্যন্তর নেই। তারা অবশ্যই তা বহন করতে হবে। তাদেরকে এ দুর্যোগপূর্ণ নির্মম মূল্য দিতে হবে।

---

[৬] এর ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য : ইমাম ফখরুদ্দীন আল রাজী, আত তাফসিরুল কবীর, ১৩ খণ্ড, পৃ. ৩২।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পাঠ উপেক্ষা করার ফলাফল

দ্বিতীয় পাঠ তথা মহাবিশ্ব ও প্রকৃতি অধ্যয়নকে উপেক্ষা করা এবং জগত পরিবেশ হতে দূরে থেকে ওহি তথা আল কুরআন অধ্যয়নও নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। কেননা এ ধরনের অধ্যয়ন দুনিয়া থেকে পলায়ন প্রবণতার দিকে ধাবিত করে। দুনিয়া ও এতে যা কিছু আছে, সব কিছুকে অপবিত্র জ্ঞানে ঘৃণা করার পথে নিয়ে যায়। সভ্যতা গড়ার ক্ষেত্রে তার মাঝে সুপ্ত প্রতিভা শক্তি সামর্থ্য স্তব্ধ ও পঙ্গু হয়ে যায়। বিশ্বচরাচরের খেলাফত, আমানত ও সভ্যতা গড়ে তোলার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাকে অকর্মন্য করে দেয়। তার মাঝে ও সৃষ্টি জগতের আনুগত্য পাওয়ার নেয়ামত ভোগ করার মাঝে দেয়াল রচনা করে। তার চিন্তাশক্তি নিষ্ক্রিয় করে দেয়। শুধু তার চিন্তাশক্তির কাজের মানই নষ্ট করে না, বরং কর্মতৎপরতাকে বিনষ্ট করে দেয়। তখন মানুষ নিজেকে কোনো কিছুতে সকর্মক হিসেবে দেখবে না। তার জীবনের কোনো মানে খুঁজে পাবে না। অথচ এসব চিন্তাভাবনা সব কিছু মহাগ্রন্থ আল কুরআনের পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত– বিরুদ্ধ।

মহাবিশ্ব অধ্যয়ন তথা দ্বিতীয় পাঠ উপেক্ষা করলে কিংবা প্রথম পাঠের সাথে সমন্বয় না করা হলে সভ্যতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মানুষের অক্ষমতা দেখা দেবে। তাদের শক্তিসামর্থ্য অকেজো হয়ে যাবে। আর অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এ সমন্বয়হীনতায় দৃশ্যমান জগত ও অদৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন বিষয়াদি আজগুবি, ওল্টাপাল্টা প্যাঁচালো ও মিশ্রিত মনে হবে।

যারা শুধু ওহিজ্ঞান অধ্যয়ন তথা প্রথম পাঠেই সীমিত থাকেন, তারা কখনো কখনো ভাবতে পারেন যে, মানুষ যদি নিজ কাজে তার ভূমিকা আছে বলে মনে করে, তবে তাতে মহান সৃষ্টিকর্তার শক্তিমত্তার পবিত্রতা রক্ষিত হবে না। তারা আরো ভাবতে পারেন, মানুষের কর্মশক্তি নেই, ইচ্ছাশক্তি ও নির্বাচনশক্তি নেই। তাদের মতে, এ ধরনের ধারণাই আল্লাহ তায়ালার কুদরতের পবিত্রতা রক্ষা করে। এ ধরনের ভাবনাই (খ্রিষ্টীয়) ঈশ্বরীয় (পৌরহিত) তন্ত্রের ন্যায় জীবন চলার পথে কাজে কর্মে মানুষের ভূমিকাকে ছিনিয়ে নেয়া হয়।

আগেকার দিনের (আবুল হাসান আশ'আরী (মৃ. ৩৩০হি.) রচিত) মাকালাতুল ইসলামিয়্যিন-নামক গ্রন্থসহ মুসলিম ফিরকা বা উপদল বিষয়ে রচিত অন্যান্য গ্রন্থের ওপর কেউ দৃষ্টি দিলে সেখানে বিস্ময়কর অবস্থা পেয়ে যাবে। কারণ সে সব লেখায় আল্লাহ তায়ালার কর্ম ও মানুষের কর্ম বর্ণনা, মানুষের ইচ্ছাশক্তি, ইখতিয়ার, মতের

www.pathagar.com

স্বাধীনতা, হেতু ও কার্যকারণ ইত্যাদিতে এলোমেলো ও মিশ্রিত কথাবার্তার সন্নিবেশ ঘটেছে। এ ধরনের এলোমেলো মিশ্রণের কারণে জ্ঞানতত্ত্ব ব্যবস্থায় অনেক বিশৃঙ্খলা ও অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়েছে।

সুতরাং ওহিজ্ঞান আল কুরআন অধ্যয়ন ও মহাবিশ্ব অধ্যয়নের মাঝে সমন্বয় সাধন ও ঐক্যতান প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। মানবসমাজ যেন ওপরে বর্ণিত উভয় ধরনের অন্ধাবস্থায় নিপতিত না হয়। এহেন অবস্থায় বলা যায় আমরা যাকে জ্ঞানের ইসলামিকরণ বা ইসলামি রূপায়ন বলে আখ্যায়িত করেছি, তার প্রয়োজনটি জ্ঞানগত ও সভ্যতাগত। আর এর প্রয়োজনীয়তা শুধু মুসলিম নয় বরং সারা বিশ্বের জন্য। যেন সমসাময়িক জ্ঞান-ব্যবস্থায় ভয়ানক সংকীর্ণতা ও বিশ্বজনীন মানস সংকট থেকে উত্তরণ লাভ করা যায়।

পাশ্চাত্য সভ্যতা তার চিন্তাধারার পদ্ধতির পুনর্গঠন করতে গিয়ে নিজেই সমস্যায় নিপতিত হয়। আর তা হলো তার সভ্যতা ও জ্ঞানের পদ্ধতিগত রূপ বা কাঠামোর ধরন কী হবে তা নির্ধারণে ব্যর্থতাজনিত সমস্যা। যে কাঠামো বা ধরনের ভিত্তিতে তারা তাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের সব দিকের ক্রমবিকাশকে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিল।

অবশ্য দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ফ্রেম বা ছাঁচে ঐ ধরনের একটি ধাঁচ বা ধরন তৈরি করার জন্য পশ্চিমা জগতে একটি প্রচেষ্টাস্বরূপ ছিল মার্কসবাদের উন্মেষ। আর এই তো সেই মার্কসবাদ! সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ার সাথে সাথে তারও পতন ঘটে। পাশ্চাত্য সমাজ তাদের সভ্যতা ধরে রাখার জন্য এ মতবাদের ভিত্তিতে বাস্তবে তাদের সভ্যতা, জ্ঞান ও তার পদ্ধতির জন্য একটি দার্শনিক বিকল্প কাঠামো লাভ করার পূর্বেই খোদ সেই মতবাদেরই পতন হলো। মার্কসবাদীদের কাছে উত্থাপিত চূড়ান্ত পর্যায়ের অনেক প্রশ্নের জওয়াব দানের আগেই সেই মতবাদের পতন ঘটল। যেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অধুনা জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীরা তাদের চেহারায় বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন।

কিন্তু আমরা আরব ও মুসলমান হিসেবে আমাদের সংকটটি প্রকট ও প্রবল। আমরাও একদিকে বিশ্বজনীন সংকটের অংশীদার। কেননা এ সংকটের সাথে আমাদের সম্পর্কটা বহির্দেশগত কিংবা প্রান্তিক নয়, যেমনটি কেউ কেউ ধারণা করে থাকেন। সমসাময়িক (পশ্চিমা) সভ্যতা তার বুদ্ধিবৃত্তিক, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রাসনের মাধ্যমে তার পদ্ধতি জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক চেতনা ও মহাবিশ্ব পরিক্রমা সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা শুধু আমাদের উপর নয়; বরং গোটা বিশ্বের ওপর চাপিয়ে

www.pathagar.com

দিতে সফল হয়েছে। এমনিভাবে ইতিহাস, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা, সংস্কৃতি, প্রগতি, পশ্চাৎপদতা ইত্যাদি সম্পর্কে সেই সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গিও সবার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।

সুতরাং জ্ঞান ইসলামিকরণ প্রত্যয়টির হাকিকত বা মূলতত্ত্ব ও বাস্তবতা কী, যেটিকে আমরা জ্ঞান ও চিন্তাজগতে আমাদের তথা বিশ্বসমাজের সংকট উত্তরণের উপায় হিসেবে উপস্থাপন করতে চাচ্ছি।

জ্ঞান ইসলামিকরণ বিষয়টি অস্তিত্ব লাভ করবে, বাস্তবায়িত হবে দু'টি কিতাব (গ্রন্থ) পাঠের মাধ্যমে। এর ভিত্তি রচিত হবে উভয় কিতাব মুখোমুখি করার ওপর, এর পরিপূরকতার দিকটি বের করার ওপর এবং উভয়ের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উদ্ভাবনী কাজে পদ্ধতিগত ভাবনার ওপর। ঐ দু'টি গ্রন্থের প্রথমটি হলো: পঠিত ওহি গ্রন্থ তথা আল কুরআন। দ্বিতীয় গ্রন্থটি হলো চলমান মহাবিশ্ব। যা বাহ্যত অস্তিত্বশীল গোটা সৃষ্টিজগতকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও বিস্ময়কর মহাজগত উভয়েই একে অপরের বিভিন্ন প্রসঙ্গে দলিল-প্রমাণ পেশ করে থাকে। পথের সন্ধান দেয়। মৌলিক তত্ত্বাদি, নিয়মশৃঙ্খলা উপস্থাপন করে থাকে। আল কুরআন (মানবসমাজকে) ধাবিত করে মহাবিশ্বের দিকে। মহাবিশ্বও (তাদেরকে) পরিচালিত করে আল কুরআনের দিকে। এ প্রেক্ষাপটেই আমরা একটি পরিভাষা নিরূপণ করি, যা হলো : আল জাম'উ বাইনাল ক্বেরআতাইন' (الجمع بين القرءاتين) অর্থাৎ দুটি পাঠ বা অধ্যয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধন। যা হলো : অদৃশ্য হিসেবে প্রতীয়মান ওহিজ্ঞানের ফ্রেমে মহাবিশ্ব অধ্যয়ন করা এবং মহাবিশ্ব ও তার উপাদানসমূহের বাস্তব দিক অধ্যয়নের মাধ্যমে ওহিজ্ঞানের অধ্যয়ন। এভাবে ওহিজ্ঞান অধ্যয়ন হলো মূল থেকে শাখা প্রশাখায় নেমে আসার পর্যায়ের। আর সে পর্যায়ে মানবিয় আপেক্ষিক বোধশক্তি- সামর্থ্য অনুসারে ওহিলব্ধ মূল তত্ত্বাদির যতটুকু অনুধাবন করতে পারে সে বিবেচনায় তা সম্পন্ন হয়। অপরদিকে মহাবিশ্ব অধ্যয়ন হলো মানবিয় আপেক্ষিক বোধশক্তি সামর্থ্য অনুসারে শাখা প্রশাখা থেকে মূলের দিকে ধাবিত হওয়ার পর্যায়ের। সুতরাং ওহিজ্ঞানের অবদান ও মানবিয় বাস্তব জ্ঞানার্জনের ফলাফলের মাঝে তথাকথিত বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে না। ওহি নাজিল হওয়ার সূচনায় সুরা আলাকে এর ওপরই জোর দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

www.pathagar.com

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ . خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ .
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

> পাঠ করুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাটবাধা রক্তপিণ্ড হতে। পাঠ করুন, আর আপনার প্রতিপালক মহা মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না (সুরা আলাক ৯৬ : ১-৫)।

অতিসংক্ষেপে বলতে গেলে এটাই হলো দুই ধরনের পাঠ তথা অধ্যয়নের তাৎপর্য ও গুরুত্ব। আর এ দুই ধরনের অধ্যয়নের মাঝে যদি বিচ্ছেদ ঘটে, তা হলে মানবিয় জ্ঞানগত পদ্ধতি দু'টি মারাত্মক পরিণতির দিকে ধাবিত হবে।

অধ্যয়নে শুধু গায়েবি দিকের সাথে যারা সম্পৃক্ত তথা ওহিজ্ঞান অধ্যয়নে নিমগ্ন, তারা বস্তু জগত ও তার উপাদানসমূহ অধ্যয়নের দিকটি বাদ দেবে। এর পরিণতিতে তারা ধর্মকে একটি ঈশ্বরতন্ত্র ও পৌরহিত্যে রূপান্তরিত করবে, যা মানুষ ও জগতের স্বাভাবিক পরিচয় ছিনিয়ে নেবে। তারা অস্বীকার করে বসবে সকল বস্তুগত উপকরণ, গতি তত্ত্বাদি ও এদের দ্বারা সংঘটিত বিষয়াবলিকে। তারা অস্বীকার করবে সকল সামাজিক, ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক নিয়মকানুন, যা দ্বারা মানুষ কর্মতৎপর রয়েছে। অবশেষে এভাবে এ ধরনের পাঠকগণ তাদের চিন্তাধারায় জড়তা ও বন্ধ্যাত্ব অবস্থায় পৌঁছে যাবে। তারা তাদের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করলে ধর্মের ওপরই কখনো কখনো ভুল ধারণা করে বসতে পারে।

অপরদিকে যারা শুধু মহাবিশ্ব অধ্যয়নের সাথে সম্পৃক্ত এবং বস্তুজগত কেন্দ্রিক অধ্যয়নের ওপর সীমাবদ্ধ, তারা এ সৃষ্টিজগত ও তার গতি নিয়ন্ত্রণে অদৃশ্য থেকে ক্রিয়াশীল দিকটি বাদ দিয়ে দেয়। যা অবশেষে তাদেরকে ক্রমান্বয়ে বাস্তববাদ (Realism)[৭] প্রসূত চিন্তাধারার দিকেই নিয়ে যায়, যা সভ্যতা সুগঠিত করার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এভাবেই মানবসমাজ বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে দুই ধরনের লোকের মধ্যে। একদিকে ঈশ্বরতন্ত্র মন্ত্রে পুষ্ট যাজকীয় পৌরহিত্যের অনুসারীগণ, অন্যদিকে নাস্তিকতা বা অজ্ঞতাভিত্তিক বাস্তববাদ (Realism)-এর অনুসারীগণ।

---

[৭] বাস্তববাদ মানে এমন মতবাদ, যা মনে করে কল্পনাসর্বস্ব নয়, ইন্দ্রিয়গোচর জগতই একমাত্র সত্য। –অনুবাদক

www.pathagar.com

অথচ প্রাথমিক ওহি সুরা আলাকে নিরেট গায়েবি শক্তির মদদ পুষ্ট ঈশ্বরতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বরং গায়েবি ওহি অধ্যয়ন ও মহাবিশ্ব অধ্যয়ন তথা কলমের মাধ্যমে বাস্তবতা অধ্যয়নের মাঝে মিলন ঘটানো হয়েছে। এমনিভাবে নিরেট বাস্তবতা অধ্যয়নকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, সৃষ্টিজগতের প্রসঙ্গের সাথে ওহিজ্ঞান অধ্যয়নের কথা জুড়ে দিয়ে। অনুরূপভাবে প্রাথমিক ঐ ওহির বাণীসমূহ আরো যে বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে তা হলো : উভয় দিক অধ্যয়নকারীই সেই মানুষ যে ওহিজ্ঞানে বিশ্বাসী। সেই ওহিজ্ঞান তাকে দৃঢ়তার সাথে বুঝিয়ে দিচ্ছে এ জগত ও তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে। তখন মানুষের সুপ্ত প্রতিভা স্তিমিত করে রাখার ঘটনা সংঘটিত হবে না, তার অবস্থানে বিচ্যুতি ঘটানো হবে না, তার ভূমিকাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করা হবে না।

নিশ্চয় ঐ দুই ধরনের অধ্যয়নের মাঝে দেয়াল তৈরি করা হলে, উভয়কে পৃথক অবস্থানে নিয়ে গেলে মানবসমাজ তাদের জ্ঞানগবেষণা পদ্ধতি এবং ধর্মীয় ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলোর শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন রকম বিচ্যুতির দ্বারা আক্রান্ত হবে। এতে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হবে। সমসাময়িক জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো জাতিই এমন একটি কাঠামোতে পৌঁছতে পারেনি, যার ভিত্তিতে ছাত্রদেরকে একই সময়ে দুইধরনের জ্ঞানে পারদর্শী করে তুলতে পারে। এর কারণ হলো, পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা গোটা বিশ্বে ঐ দুই ধরনের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। তাই ওহিজ্ঞানের শিক্ষার্থী থিওলজি (ধর্মতত্ত্ব) কলেজ বা শিক্ষানিকেতনে গমন করে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলোর শিক্ষার্থী ফলিত বিজ্ঞান কলেজগুলোতে গমন করে। যেমনটি পাশ্চাত্যজগতে প্রচলিত আছে। আর আমাদের সমাজেও তাই। যেখানে শিক্ষার্থীরা হয় শরিয়াহ কলেজ, দাওয়াহ ও ধর্মতত্ত্ব কলেজে গমন করে কিংবা আধুনিক বিজ্ঞান কলেজে, নতুবা সামাজিক ও মানবিক বিজ্ঞান কলেজগুলোতে গমন করে থাকে। ফলিত বিজ্ঞান শাখা তো রয়েই গেল। এসব শাখার মাঝে বিরাট ফারাক বিদ্যমান।

দুই ধরনের অধ্যয়ন প্রক্রিয়ার মাঝে বিদ্যমান পৃথকীকরণটি এক অনাকাঙ্ক্ষিত ফাটল সৃষ্টি করে, যা আরেকটি মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। কেননা এটা শরিয়াহ তথা কুরআন সুন্নাহভিত্তিক জ্ঞান বিজ্ঞান এবং অন্যান্য সামাজিক ও মানবিক বিজ্ঞানগুলোর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় মানব রচিত শিক্ষা পদ্ধতি ও ব্যবস্থা ঐসব মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে এবং

www.pathagar.com

এগুলোকে শুধু মহাবিশ্ব অধ্যয়ন মোতাবেক তৈরি করে। সাথে সাথে এগুলোকে শরিয়াহভিত্তিক জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রভাব ও ওহির দিকনির্দেশনা থেকে দূরে নিয়ে যায়।

এমনিভাবে শরিয়াহ বা ওহিভিত্তিক জ্ঞান বিজ্ঞান বহনকারীগণ জটিল জটিল উপাদানে গঠিত এ পরিবর্তনশীল সমাজে কোনোরকম প্রভাব বিস্তার করতে শক্তি সামর্থ্য অনেকাংশে হারিয়ে ফেলে। কেননা এসব সমাজের অবস্থা ও এর বিভিন্ন মৌলিক বিষয়াদির সাথে কাজ করার পন্থাগুলো অনুধাবন করতে যেসব সামাজিক ও মানবিক জ্ঞান বিজ্ঞান সহায়তা করত, তা অধ্যয়ন থেকে দূরে থাকার কারণে সে সহায়তা লাভ সম্ভব হচ্ছে না। আর এদিকটি ওহিজ্ঞান এবং সামাজিক ও মানবিক জ্ঞান বিজ্ঞানের মাঝে সম্পর্কের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে অত্যন্ত জোরালোভাবে ফুটিয়ে তুলছে।

এখানে উল্লেখ্য, মনোবিদ্যা, মানবিক শিক্ষা সংস্কৃতিভিত্তিক অন্যান্য জ্ঞানের শাখায় এবং সভ্যতার পরতে পরতে প্রচুর ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে আল কুরআন ও জগত সংসারের সম্মিলিত ধারায় অধ্যয়ন হওয়া অত্যাবশ্যক।

সুতরাং সমসাময়িক মুসলিম সমাজের সংস্কৃতি গড়ার লক্ষ্যে উভয় ধরনের অধ্যয়নের সমন্বয় সাধন অতীব জরুরি। এটা অবশ্যই ইউরোপীয় পশ্চিমা ধাঁচ থেকে ভিন্ন হওয়া উচিত। যেখানে চূড়ান্ত ফয়সালায় ঈশ্বরীয় পৌরহিত্য এবং বাস্তববাদিতার ছত্রছায়ায় তারা দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। এ পর্যায়ে তারা দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ ও বিচ্ছিন্ন অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। এ দ্বৈতাবস্থার ভয়াবহতা শুধু এখানেই থেমে যায়নি; বরং এ বিচ্ছিন্ন অবস্থান তাদের সভ্যতা চিন্তাচেতনার কোন কোন স্তরে এমন প্রতীতির জন্ম দিচ্ছে, যার আচ্ছাদনে জীবন ও জগৎ, মানুষ ও তার মূল্যবোধ, সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার সাথে তাদের সম্পর্কের সামগ্রিক ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিও বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক ও চারিত্রিক তথা নৈতিক মূল্যবোধের চেয়ে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই বড় হয়ে গেল। অথচ দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফসল হলো উন্নত মহৎ চারিত্রিক গুণাবলি। আর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঐ স্ফীত অবস্থাটি জাতিগত ও সামাজিক দ্বন্দ্বের বৈধতা প্রদান করছে। যেমনিভাবে এ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণার মাধ্যমে চরম ব্যক্তি স্বাধীনতা বা স্বেচ্ছাচারিতা মতবাদের বৈধতার বিষয়টিও চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছে। এভাবে মূল্যবোধের ফসল শান্তির পরিবর্তে সবধরনের দ্বন্দ্ব বিরাজ করার ধারণাটিই অভিষিক্ত হলো।

www.pathagar.com

আর এটা এজন্য যে, এসব মানুষ নিজেদের সব কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী মনে করছে। এমনকি যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন, তাঁরও প্রতি তারা মুখাপেক্ষী নয় বলে মনে করছে। হ্যাঁ, আল্লাহ তায়ালার প্রতি যে মুখাপেক্ষী নয় বলে মনে করে, সে পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করতেই পারে। যারা মূল্যবোধ ও চারিত্রিক বাধ্যবাধকতার প্রতি আহ্বান জানাবে তাদের ওপর ওরা দাম্ভিকতা- ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করবে। এ কারণে আল-কুরআনের সুরা আলাকের যে আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল কুরআন ও মহাবিশ্ব অধ্যয়নের বিষয়টির সমন্বয় সাধন করা হয়েছে, সেখানে এর সাথে মানুষের সীমা লঙ্ঘন করা ও গর্বোদ্ধত হওয়ার সমস্যাটির কথাও জুড়ে দেয়া হয়েছে। যখন মানুষ শুধু ফলিত বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে তাদের জাগতিক সভ্যতার বিন্যাস ঘটাবে, তখন তারা যেভাবে গর্বে ফেটে পড়বে এবং নিজেদের কারো প্রতি মুখাপেক্ষী নয় বলে মনে করে বসবে। এ মর্মে ইরশাদ হয়েছে :

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى . أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى . إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى

> বস্তুত মানুষ তো সীমা লঙ্ঘন করেই থাকে, কারণ সে নিজকে অভাবমুক্ত অমুখাপেক্ষী মনে করে। আপনার প্রতিপালকের নিকট (তাদের) প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত (সুরা আলাক ৯৬ : ৬-৮)।

সুতরাং উভয় ধরনের অধ্যয়নের মাঝে সমন্বয় সাধন করা জ্ঞানের জগতে একটি পদ্ধতিগত দাবি, যা সভ্যতাগত ফলাফল তৈরি করবে। ঐ দুই ধরনের পাঠ তথা অধ্যয়নের মধ্যে যে সমন্বয় সাধন করবে, সে আল্লাহ তায়ালা হতে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করবে না। সে সদা অনুভব করবে যে, আল্লাহ তায়ালার প্রতি তার মুখাপেক্ষিতা বিদ্যমান। আর তখন সে স্বৈরাচারী হবে না, পৃথিবীতে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করবে না, বিপর্যয় ডেকে আনবে না বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না, সীমা লঙ্ঘন করবে না।

দুই ধরনের পাঠ বা অধ্যয়নের মাঝে সমন্বয় সাধনের পদ্ধতি

দু'টি পাঠের মাঝে সমন্বয় সাধনের কাজটির প্রবেশদ্বার শুরু হয় এমন একটি প্রকল্পিত পদ্ধতিগত সম্পর্ক বের করার মাধ্যমে, যে সম্পর্ক বিরাজমান রয়েছে আল কুরআনের আয়াতের পদ্ধতিগত বিন্যাসক এবং অস্তিত্বশীল জগত ও তার গতির বিভিন্ন নিয়মকানুনের মাঝে। সেই সুবিন্যস্ত-পরিকল্পনাকারী তথা প্রাজ্ঞ বিন্যাসক,

www.pathagar.com

যিনি জগত ও এর নিয়মের মাঝে এবং আল কুরআনের মাঝে সম্পর্ক রচনা করে দিয়েছেন। কুরআন হলো আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ওহি। যার জ্ঞান তত্ত্ব ও তথ্য সব কিছু মৌলিক, ব্যাপক পরিমণ্ডলে বিস্তারকারী ও সার্বিক। এ মহাগ্রন্থের মাধ্যমে আমরা এ অস্তিত্বশীল জগত বুঝে থাকি, যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারি। তবে ততটুকুই বুঝতে পারব ও অনুধাবন করতে পারব, যতটুকু আমরা উভয়টি সম্পর্কে একই সাথে ধারণা নিতে সক্ষম হবো এবং উভয়টির অধ্যয়ন প্রক্রিয়ায় সমন্বয় বিধান করতে সামর্থ্যবান হবো।

সুতরাং আল কুরআনের ম্যাথডোলজিই (পদ্ধতিবিজ্ঞানই) মহাজগতের ম্যাথডোলজি। আর এটা শুধু তাত্ত্বিক দিকের ওপর সীমাবদ্ধ থাকা লক্ষ্য নয়, বরং বাস্তবেও সে সম্পর্কটা উন্মোচন করতে হবে। তাত্ত্বিক কথা বার্তায় হয়তো এমন একটি প্রতীতি বা অনুমান প্রকাশিত হতে পারে, যা সঠিক নাও হতে পারে কিংবা যাতে আপত্তিও উঠতে পারে। সুতরাং আধুনিক তথা সমসাময়িক মুসলমানের সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হলো উভয় ধরনের ম্যাথডোলজির জ্ঞান। যা বের হয়ে আসবে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ওহিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক ও মানবিক জ্ঞানবিজ্ঞানের মাঝে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে। যেসব জ্ঞান বিজ্ঞান মানুষ, জীবন ও জগতে কার্যকর আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত নিয়মকানুন অধ্যয়নের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

আর আল কুরআনের বড়ত্ব বা মাহাত্ম্যের কথা যদি বলতে হয়, তা হলে বলব, সত্যিকার অর্থে আল কুরআন মহান, বাস্তবে এটি অলৌকিক। এ গ্রন্থের মাহাত্ম্য ও অলৌকিকতা বর্ণনায় মানুষ হাজার হাজার নয়, বরং লাখ লাখ পৃষ্ঠা রচনা করেছে। কিন্তু এ বিশাল রচনা ভাণ্ডার আল কুরআনের সেই ম্যাথডোলজি উন্মোচন করতে সক্ষম হয়নি, যা এ মহাবিশ্ব ও তার গতিধারা সম্পর্কে তত্ত্ব ও তথ্যাদি বিবৃত করেছে। যাকে হেদায়েতের স্বার্থে ব্যবহার করা যেত, তথা যাকে পথনির্দেশনা দানের মৌলিক দিকে ও সত্য দ্বীন প্রমাণের কাজে প্রতিষ্ঠা করা যেত।

এমনিভাবে এ বিশাল রচনা সমগ্র আল কুরআন অধ্যয়ন ও মহাবিশ্ব অধ্যয়নের মাঝে সংমিশ্রণ ও আন্তঃপ্রবেশমূলক ম্যাথডোলজিও প্রকাশ করতে পারেনি। এখনো অনেক আয়াত ও ধর্মীয় কথাবার্তা বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। এসব ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রত্যাখ্যাত ইসরাঈলী উপাখ্যানের মতো আরো অনেক কিছুর প্রভাব বিদিত। অনুরূপভাবে আধুনিক যুগের মানবিক ও সামাজিক জ্ঞান বিজ্ঞান এমনকি সমসাময়িক প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অনেক দিক চূড়ান্ত ফলাফল অর্জন

www.pathagar.com

ব্যতিরেকেই বিরাজমান। এমন অনেক প্রশ্ন রয়েছে, যেগুলোর সম্মুখীন হয়ে মানুষ দিশেহারা। কিন্তু ঐ সব জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে যথাযথ প্রতিষেধক বা তৃপ্তিকর জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। এসব ব্যর্থতার মূলে যে কারণটি নিহিত তা হলো, এখানে আল কুরআন ও মহাবিশ্ব অধ্যয়ন পদ্ধতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক বা আন্তঃপ্রবেশমূলক দিকটি স্পষ্ট করা হয়নি। আর যতটুকু স্পষ্ট করা হয়, তাও আংশিক, যা কিছু কিছু ক্ষেত্র বেছে নিয়ে প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত। এসব প্রচেষ্টার কোন কোনটা জোড়াতালি লাগানোস্বরূপ বা সমঝোতামূলক। এ ধরনের প্রচেষ্টা অনেকাংশে ভাঁওতাবাজিপূর্ণ পণ্ডশ্রম হিসেবে সুবিদিত। সম্প্রতি ঐ ধরনের প্রচেষ্টাগুলো আল কুরআনের বৈজ্ঞানিক অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা বা মুজিযা[৮] প্রকাশক রূপে পরিচিতি লাভ করেছে।

---

৮ এর সাথে জ্ঞান ইসলামিকরণের বিষয়াদির পার্থক্য অনেক। কেননা জ্ঞান ইসলামিকরণ কর্মটি বিভিন্নভাবে যার ওপর গুরুত্বারোপ করছে তার মর্ম হলো, এটি উভয় ধরনের পাঠ তথা আল কুরআন ও মহাবিশ্ব অধ্যয়নের মাঝে সমন্বয় সাধনের ওপর নির্ভরশীল। যাতে ওহিজ্ঞান জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে ধরা হয়। এর ভিত্তিতে মহাবিশ্ব পাঠ তথা অধ্যয়ন করা হয়। এ ওহিজ্ঞান বুঝার জন্য মহাবিশ্ব ও তার নিয়মকানুনের সাহায্য নেয়া হয়। এ উভয় ধরনের অধ্যয়নের গণ্ডিতে এবং উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে জ্ঞান ইসলামিকরণের মূলভিত্তি রচিত হয় ও তার মূলনীতি তৈরি করা হয়। কিন্তু এসব বিষয় আল কুরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা বিষয় থেকে ভিন্নতর। কারণ জ্ঞান ইসলামিকরণ বিষয়টি একটি সামগ্রিক ম্যাথডোলজি বা পদ্ধতি, যা আল কুরআনের জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে পথ চলে। তার এ চলাটি সমগ্র কুরআনকে সামনে রেখে এবং এর ভিত্তিতে মহাবিশ্ব অধ্যয়ন। অপরদিকে বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা আল কুরআনের অংশবিশেষের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিয়ে থাকে। তার চলার পথ বা প্রচেষ্টার ধরন সামগ্রিকতাপূর্ণ নয়, বরং খণ্ডিত, যা বিজ্ঞান ও কুরআনের মধ্যে সমঝোতামূলক কাজের পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে। এটাকে আল কুরআনের কোন বিষয় সহিহ প্রমাণের জন্য এক প্রকার বৈজ্ঞানিক স্বীকৃতি অর্জনের প্রচেষ্টা বলা যায়। এ ধরনের প্রচেষ্টায় কিছু কিছু উপকারিতা থাকলেও এটি শুরু হয় বিজ্ঞান দ্বারা আল কুরআন বুঝার জন্য। এর পথচলা শুরু হয়, আল কুরআন দ্বারা বিজ্ঞান বুঝার জন্য নয়। অথচ আল কুরআন থেকে শুরু করলে বাস্তববাদিতার নামে যে পরিমণ্ডল গড়ে তোলা হয়েছে, তা থেকে বিজ্ঞানকে বের করে আনা যেত, তাকে রক্ষা করা যেত। এমনিভাবে আল কুরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা পরিমণ্ডলে যে গবেষণা কাজ হয় সেটা পদ্ধতিগত আকার আকৃতি ধারণ করে না। বরং এটি কিছু বাছাই করা বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেসব বিষয়ে আল কুরআনের আয়াত ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবস্থান নিবিড় করার প্রয়াস কার্যকর থাকে। কিন্তু এটা একটি বিষয়। অপরদিকে জ্ঞান ইসলামিকরণ বিষয়টি অন্য বিষয়, যা গড়ে উঠে একটি পরিকল্পনা ও পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে। সুতরাং পদ্ধতিনির্ভর জ্ঞান ইসলামিকরণ লক্ষ্য পথ ও নির্বাচিত বিষয়নির্ভর বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা-এর লক্ষ্য পথ ভিন্ন। এ বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতার লক্ষ্যসমূহ অনেকটা সীমিত হয়ে

www.pathagar.com

তাই উভয়বিধ অধ্যয়নের মাঝে সমন্বয় করা ওয়াজিব হওয়ার ওপরই আমরা সতত জোর দিচ্ছি। আর এটাকে বর্তমান বিশ্বে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চিন্তন ও জ্ঞানতাত্ত্বিক সংকট উত্তরণের কঠিন পূর্ব শর্ত হিসেবে গণ্য করছি। এ শর্তটি আল কুরআন, মহাবিশ্ব ও মানুষের মাঝে ঐ ম্যাথডোলজিমূলক গভীর সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে তাগিদ দিচ্ছে। যেন ইসলামি চিন্তাধারার বৃত্তসমূহ পরিপূর্ণ হয়, এর সব নিয়ামক ও উপাদানগুলো স্পষ্ট হয় এবং প্রকৃতি ও মানুষের সাথে অদৃশ্য জগতের সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। এর সাথে মানুষ যেন রক্ষা পায় সেই কষ্টদায়ক ফাটলের গ্লানি থেকে, যা বিভেদ সৃষ্টি করেছে আল্লাহত্ব ও মানবত্বের মাঝে, দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ওহিজ্ঞান ও মানবরচিত বাস্তববাদী মতবাদের মাঝে। ঐ বিরক্তিকর ফাটলটি এখানে সেখানে এ ধরনের আরো কত সমস্যা টেনে এনেছে ও আনছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই।

আল কুরআন ও মহাবিশ্ব অধ্যয়নের মধ্যে সমন্বয় ধারা রচনার এ গুরু দায়িত্ব সেই পালন করতে পারবে, যে আল কুরআনের জ্ঞান অর্জন করেছে এবং অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের যথেষ্ট পরিমাণ অংশ আয়ত্ত করেছে। যেন উভয় প্রকার জ্ঞান দ্বারা আল কুরআন, মহাবিশ্ব ও মানুষের সংমিশ্রিত ম্যাথডোলজি উন্মোচিত করা যায়। এ জন্য ইসলামিকরণ (Islamization) এর মূলনীতিসমূহ নিম্নবর্ণিত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো হয় :

এক

জ্ঞানের জগতে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্গঠন করা। যে দৃষ্টিভঙ্গিটি নির্মল নিখাদ ইসলামি আকিদা বিশ্বাস ধ্যানধারণার মৌলিক উপাদান ও বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেন কোনো বিষয় উপেক্ষা না করেই মৌলিক চূড়ান্ত প্রশ্নমালার উত্তর দিতে ইসলামি জ্ঞানগত ব্যবস্থা সক্ষম বলে গণ্য করা সম্ভব হয়। জ্ঞান সমীক্ষণে সক্ষম ব্যক্তিসত্তার শক্তি সামর্থ্য গড়ে তুলতে হবে। সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে যা আয়ত্ত করা ও চালিয়ে নেওয়া সম্ভব। একই সময়ে তা পদ্ধতি বিজ্ঞান উদ্ভাবনেও সামর্থ্য

যায় একটি বিষয়ে, তা হলো : বৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান কিছু ইসলামি বক্তব্য ও আয়াতে কুরআনি এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাঝে বৈপরীত্য নেই বলে প্রমাণ করা। এ ক্ষেত্রে ভালো কিছু যা বের হয়ে আসে, তাকে আধুনিক তাফসির করার প্রচেষ্টা হিসেবে সন্নিবেশিত করলেও করা যেতে পারে। যদিও এসব ব্যাখ্যার দ্বারা যা বুঝানো হচ্ছে, তা ব্যতীত অন্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনাও প্রচুর।

www.pathagar.com

প্রদান করবে। এমনিভাবে তা জ্ঞানগত ব্যাখ্যায় সামর্থ্যবান করে তুলবে। যে ব্যাখ্যা আবেগ উদ্দীপনার ওপর নয়, বরং পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি বিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

দুই

আল কুরআনের পদ্ধতি বিজ্ঞানের আলোকে ও নির্দেশনায় ইসলামি পদ্ধতি বিজ্ঞানের মূলনীতি গঠন, রূপায়ন ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পুনর্গঠন। কেননা একক ও আংশিক অধ্যয়নের ফলে ঐ ইসলামি পদ্ধতি বিজ্ঞান নানা দিক দিয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যে অধ্যয়ন আল কুরআনকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছে, জীবন জগত থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। অপরদিকে ঐ একক ও বিচ্ছিন্ন অধ্যয়ন প্রক্রিয়া পূর্বে ও বর্তমানেও আল কুরআনের গণ্ডিবহির্ভূত অবস্থানে থেকে সৃষ্টিজগত ও মানুষকে অধ্যয়ন করছে। তাই ইসলামি পদ্ধতি বিজ্ঞানকে পুনর্গঠন করতে হবে, যেন মুসলিম মানস ঐসব চিন্তাধারাগত ব্যাধি থেকে মুক্ত হতে পারে। যেসব ব্যাধি সে মুসলিম মানসকে পঙ্গু করে দিয়েছে। যেমন গায়েব তথা অদৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্যমান জগতের সম্পর্ক, ওহির সঙ্গে যুক্তির সম্পর্ক, ঘটনাগুলোর সাথে কার্যকরণের সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় অনুধাবনে সে মুসলিম মানস কিংকর্তব্যবিমূঢ় হচ্ছে। এতে স্থিতিশীলতার পরিচয় দিতে পারছে না।

তিন

এ পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের সাথে আচরণের পদ্ধতিও পুনর্গঠন করা। যেখানে আল কুরআনকে পথ, পদ্ধতি, জ্ঞানের উৎস এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার সৌধ নির্মাণের উপাদানগুলোর উৎস হিসেবে গণ্য করা হবে। এর জন্য এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উলুমুল কুরআন তথা কুরআনিক জ্ঞান বিজ্ঞানগুলোর পুনর্নির্মাণ ও পুনর্গঠন করা চাই। আল কুরআনের আয়াতগুলোর খেদমতে তথা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যেসব ধ্যানধারণা সৃষ্টি হয়েছে এবং উত্তরাধিকার সূত্রে মিলেছে, তার অনেক কিছুই হয়তো এ পুনর্গঠন ক্ষেত্রে এড়িয়ে যেতে হবে। আরব জনগণ আল কুরআন বুঝেছে তার রচনার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলোর ভিত্তিতে। যেসব বৈশিষ্ট্য প্রথম দিকে ছিল খুবই সহজ সরল প্রকৃতির এবং সামাজিক দিক দিয়ে ও চিন্তাধারায় ছিল ভাষাগত ধাঁচে এবং শ্রুত বিষয়াদি হিসেবে। যেসব শ্রুত বিষয়ে প্রধান বিবেচ্য বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সনদ বা বর্ণনাগত সূত্রের সহিহ হওয়া তথা বিশুদ্ধতা আছে কি না, তা লক্ষ রাখা এবং প্রচলিত বর্ণনা পদ্ধতির সঙ্গে বর্ণনাকে সুদৃঢ় করা। হ্যাঁ, বর্ণনা পদ্ধতির সঙ্গে বর্ণনা সুদৃঢ় করার বিষয়টি সে সময়ে সর্বোন্নত জ্ঞানের বিষয় হিসেবে

www.pathagar.com

রূপান্তরিত হয়েছিল। আল কুরআন ও হাদিসে নববী সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বিজ্ঞান যখন সরকারিভাবে সঙ্কলিত হচ্ছিল, তখন তাতে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলোও প্রতিভাত হয়। এমনিভাবে এর পাশাপাশি ঐ সঙ্কলন পর্যায়ে আরবি ভাষা ও তার আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যসমূহও প্রকাশিত হয়। আর তার দাবি অনুসারে শব্দ ও বাক্য গঠণ প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য করার প্রবণতারও উন্মেষ ঘটেছিল। আর এটাই ছিল সে সময়ে প্রচলিত পদ্ধতি বিজ্ঞান। কিন্তু বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ের পদ্ধতিগত অনুধাবনের চেতনা প্রাধান্য লাভ করেছে। যেমনি এখন আরো প্রাধান্য লাভ করেছে বিভিন্ন সমাজ নিয়ন্ত্রণকারী সম্পর্কের বিশ্লেষণ ও যুক্তিভিত্তিক পর্যালোচনা করার প্রবণতা। যাতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নিয়মনীতিমালা ব্যবহার করা হচ্ছে। আর এসবকে সমাজ ও সভ্যতার বিভিন্ন বিষয়ের সাথে মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে। সুতরাং আল কুরআন অনুধাবন ও অধ্যয়নে সহায়ক সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি নতুনভাবে দৃষ্টিনিবদ্ধ করা প্রয়োজন। তাই এ মহাগ্রন্থটি অধ্যয়নের সাথে মহাবিশ্ব অধ্যয়নের সমন্বয় ও আন্তঃসম্পর্কীয় পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। এমনিভাবে এ প্রক্রিয়াটিকে মুক্ত করতে হবে ঐ পর্যায়ের তাফসির ও তাবিলের অনেক কিছু থেকে। প্রত্যাখ্যাত ইসরাঈলি বর্ণনার মতো আরো অনেক কিছু অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট হতে হবে। আল কুরআন অধ্যয়ন পদ্ধতিকে আয়াত নাজিল হওয়ার পন্থা, এ সবের পূর্বাপর সম্পর্কের সাথে পূর্ণ মিলন ঘটাতে হবে। যেন এর দ্বারা মহিমান্বিত কিতাব আল কুরআনের চ্যালেঞ্জের বিভিন্ন দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর সে গ্রন্থের অলৌকিকতার বিভিন্ন দিকের সাথে তার সামাজিক ও পদ্ধতি বিজ্ঞানগত দিকটিও সংযোজন করা উচিত। যেন তার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জটি অনিমেষ রূপে প্রমাণিত হয় এবং তার অলৌকিকতা বিদিত হয়। আর এটাই তো তার সামগ্রিকতা ও সার্বিকতার পক্ষে প্রথম পদ্ধতিগত দলিল।

চার

পদ্ধতি বিজ্ঞানের ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র সুন্নতে নববীর ব্যবহার পদ্ধতিও পুনর্গঠন করতে হবে। যেখানে বিশুদ্ধ ও পবিত্র সুন্নতে নববীকেও পথ, পদ্ধতি ও জ্ঞানের উৎস এবং কৃষ্টি ও সভ্যতার সৌধ নির্মাণের উপাদানসমূহের উৎস হিসেবে গণ্য করা হবে। রসুল সা.-এর যুগে সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারতেন, তারা তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করতেন। সে পর্যায়টি ছিল সরাসরি যোগাযোগের যুগ। যখন তিনি বলেছিলেন, আমার নিকট থেকে তোমাদের হজ্জ

www.pathagar.com

সম্পাদনের কার্যাবলি শিখে নাও। তিনি আরো বলেছিলেন, তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখছো, সেভাবে সালাত আদায় কর। সুতরাং বাস্তবে অনুসরণ ও অনুকরণের বিষয়দ্বয় রসুল সা.-এর কর্মতৎপরতার ওপর নির্ভরশীল। রসুল সা. আল কুরআনের শিক্ষাকে নিজ কাজে রূপায়ণ করতেন। তিনি তা রূপায়ণ করতেন বাস্তবতার ভিত্তিতে এবং আল কুরআনের নির্দেশনা ও জীবনের মাঝে সংযোগ স্থাপন করে। নবি সা. কর্তৃক আল কুরআনের নির্দেশনা বাস্তবায়ন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত কুরআনিক পদ্ধতির উপাদানগুলো এবং তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার মাঝে পার্থক্যের পরিধি সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। যে বাস্তবতা বিরাজমান ছিল সে সমাজ সদস্যদের বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানের পরিমাপ বা সামর্থ্যের ভিত্তিতে এবং সেখানে প্রচলিত জ্ঞান পরিমণ্ডলে সেই বাস্তবতার সামাজিক ও চিন্তাচেতনাগত বাধ্যবাধকতা বা শর্তগুলোর আলোকে। এজন্য সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যারা হাদিস বর্ণনা করতেন, তারা নবি সা.-এর জীবনের কোনো অংশ সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকতে চাইতেন না। তাঁর জীবনের সব দিক সম্পর্কে জানার জন্য তারা পাগলপারা তথা প্রচণ্ড আগ্রহ পোষণ করতেন। কেননা বিভিন্ন বিষয়ে পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিতর জন্য এটাই ছিল একমাত্র অবলম্বন। এজন্য দেখা যায়, সুন্নাহর ক্ষেত্রে রসুল সা.-এর বাণী, কাজ ও সম্মতিগুলোর বিশাল সমাবেশ ঘটেছে। একই কারণে আমরা তার সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পেয়েছি। যাতে আমরা এমনকি তার সকাল সন্ধ্যায় দৈনন্দিন কার্যাবলি, তার সন্ধি স্থাপন, যুদ্ধ, শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার ফয়সালা, নেতৃত্ব, ফাতওয়া, মানবিয় আচার আচরণ ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে সক্ষম হয়েছি। এসব ক্ষেত্রে তার অনুসৃত কর্মপন্থা সমাজ পরিস্থিতির সাথে তার আচার আচরণ পদ্ধতি বা নিয়মনীতি স্পষ্ট করে দিয়েছে। নবি সা. যে পরিবেশে বসবাস করেছেন ও কর্মতৎপর ছিলেন, এসব বিস্তারিত তথ্যগুলো সে পরিবেশ ও বাস্তবতার বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে। ঐ বাস্তব অবস্থাটি গঠন ও মননে বর্তমান আমাদের অবস্থা থেকে নিঃসন্দেহে ভিন্ন ছিল।

রসুল সা. তার সুন্নাহর মাধ্যমে কুরআনিক পদ্ধতি ও বাস্তবতার মাঝে বন্ধন রচনা করতেন। সুতরাং নবি সা. যে বাস্তবতায় বসবাস করতেন, তা এড়িয়ে গেলে তার সুন্নাহর অনেক কিছুই অনুধাবন করা কঠিন হবে। তিনি ভাস্কর্য নির্মাণ ও চিত্রাঙ্কনের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং যারা মূর্তি তৈরি করে বা চিত্রাঙ্কন করে,

www.pathagar.com

তাদেরকে কিয়ামতের দিবসে[৯] তথা আখেরাতে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হিসেবে গণ্য করেন। কিন্তু এটা বুঝা উচিত নয় যে, তখন তাঁর সে নিষেধাজ্ঞাটি ছিল দেহাবয়বকেন্দ্রিক সকল প্রকার নান্দনিকতার বিরুদ্ধে। তার সে নিষেধাজ্ঞাটি সাধারণী ও সর্বব্যাপী ছিল না। যদি এ নিষেধাজ্ঞাটির দ্বারা তাই বুঝানো হয়, তা হলে এটা আল্লাহ তায়ালার নবি হজরত সুলায়মান আ. কর্তৃক শিল্পকর্ম ও সে সম্পর্কে তার ধারণার সাথে পরস্পর বিরোধী হয়ে যাবে। কেননা হজরত সুলায়মান তার সৈন্যবাহিনীর অন্তর্গত জিনদেরকে তার চাহিদানুসারে বিভিন্ন ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কন করতে নিয়োগ করেছিলেন। তাই এটা নবি সা.-এর নিষেধাজ্ঞার সাথে পরস্পরবিরোধী হয়ে যাবে, যদি এ নিষেধাজ্ঞাটিকে সর্বব্যাপী ধরা হয়।

এমনিভাবে সমসাময়িককালে এ বিষয়ে অনেকেই প্রশ্ন করেন বা যুক্তিতর্ক সৃষ্টি করে বলেন, এসব শিল্প কর্মের দ্বারা আমাদের এসব ভাস্কর্যের ইবাদত করা লক্ষ্য নয়। তা হলে এ চিত্রাঙ্কন বা শিল্পকর্ম হারাম হবে কেন? সুতরাং নবি সা.-এর ঐ নিষেধাজ্ঞাটি এ দাবির সাথেও পরস্পরবিরোধী নয়। এ ছাড়া, কোনো খণ্ডিত ফাতওয়ার মাধ্যমে ঐ ধরনের চিত্রকর্ম তৈরির বিষয়টির সমাধান হয়ে যাবে না যে, এ ধরনের চিত্রকর্ম হালাল, আর ঐ ধরনের চিত্রকর্ম নিষিদ্ধ। বরং এসব ক্ষেত্রে আল্লাহর রসুলের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ও পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার পদ্ধতি সম্পর্কে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে যেখানে তিনি বলে ছিলেন, তোমার জাতি যদি নওমুসলিম না হতো, কুফুরি অবস্থা থেকে সদ্যমুক্ত না হতো, তা হলে আমি এ কাজটি অবশ্যই করতাম, অবশ্যই করতাম[১০]।

---

[৯] এ মর্মে হাদিসটি (أشد الناس عذابا يوم القيامة কিয়ামতের দিবসে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে মূর্তি তৈয়ারকারীরা ও চিত্রকররা) ইমাম নাসাঈ তাঁর সুনান গ্রন্থের ইমান ও তার শাখা অধ্যায়ের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি যে মানুষকে দেয়া হবে নামক পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেন (পৃষ্ঠা ৫৩-৫৬)।

[১০] এখানে হাদিসটি : ... لولا قومك حديثو عهد بالكفر ইমাম নাসাঈ তার সুনানে জাকাত অধ্যায়ের কাবা তৈরীকরণ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেন। যেখানে উল্লেখ আছে : لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت البيت على أساس إبراهيم عليه السلام وجعلت له خلفا .... হে আয়েশা! তোমার জাতি যদি কুফুরি অবস্থা থেকে সদ্য মুক্ত না হতো, তা হলে এ কাবাঘর ভেঙে হযরত ইব্রাহীম আ. যে ভিত্তির ওপর তৈরি করেছিলেন, একে আমি সে ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতাম। আর আমি এর পশ্চাত দরজা রাখতাম...।

www.pathagar.com

বস্তুত, মূর্তি ভাস্কর্য পূজা থেকে সদ্যমুক্ত একটি জাতির মধ্যে রসুল সা. মূর্তি শিল্প এবং এর প্রচার-প্রসারের মূলোচ্ছেদ করেছিলেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নবি সা.-এর বাণী ও সুন্নাহকে বিচ্ছিন্নভাবে না ধরে তার ভিত্তিতে একটি সুব্যবস্থিত ও সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে পৌছানো প্রয়োজন। বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, তার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বলা কথাগুলোকে মতানৈক্যকারীগণ পৃথক পৃথক মতামতে রূপান্তর করেছেন। এ পর্যায়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বলা ঐসব কথার ভিত্তিতে কখনো কখনো একটি বিষয়ে যা ধরে নিতে হয়, আবার এর বিপরীতও ধরে নেয়া যায়। এ যেন বিভিন্ন মাজহাবের ইমামগণের মতামতের ন্যায় অবস্থা। যেখানে একই বিষয়ে তাদের পরস্পরবিরোধী মত পাওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে যাকে রসুল সা.-এর অনুসরণ ও অনুকরণ বলে অভিহিত করা যায়, আল কুরআন নাজিল হওয়ার যুগে আরব সমাজ তাতেই ছিল ব্যাপৃত ও নিবিষ্ট। তারা তাঁর নিকট থেকে একটি ব্যবহারিক মডেল বা আদর্শ লাভ করে। তাদের জীবনযাপন প্রণালী ও বাস্তবতা অনুসারে সে মডেলটি একটি পদ্ধতির রূপ নেয়। এ পর্যায়ে রসুল সা.-এর ঐ অনুসরণ ও অনুকরণের পথ ধরেই হাদিস ও অন্যান্য বর্ণিত বিষয়সমূহের সাথে ব্যবহারিক নীতিমালা সংক্রান্ত ধারণাগুলোর উন্মেষ ঘটে। তবে এর সাথে খণ্ডিত ব্যবহার থেকে হাদিসের কার্যকারিতা হ্রাস করার প্রচেষ্টা উদ্ভূত হয়। আর এর অন্তরালে দেখা যায়, কেউ কেউ বাতেনি ব্যাখ্যা, প্রতীকী ও ইশারা-ইঙ্গিতভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের আশ্রয় নেয়। হাদিসের বাহ্য অর্থের গণ্ডি মুক্ত হতেই হয়তো তারা এ পদক্ষেপটি নিয়ে থাকে। কিন্তু বিষয়টি এখানেই থেমে যায়নি। বরং এ ক্ষেত্রে হ-য-র-ব-ল অবস্থা বা বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়। এরপর মাথাচাড়া দিয়ে উঠে গোটা সুন্নাহ বা তার অংশ বিশেষের যথার্থতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কিত সমস্যাগুলো। আমরা এখনো যার ঝামেলা বহন করছি ও গ্লানি টেনে যাচ্ছি।

হ্যাঁ, আমরা যদি সুন্নাহ ব্যবহারের নীতিমালা সম্পর্কে কুরআনিক ম্যাথডোলজি পর্যন্ত পুরাপুরি পৌছতে পারতাম, যে ম্যাথডোলজি সুন্নাহর সব শাখা প্রশাখার সাথে আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ করত, তা হলে এর আওতায় সুন্নাহর ঐ সব শাখা প্রশাখায় বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন বিষয়াদি অনুধাবন করা যেত। এসব অনুধাবন করা যেত শরিয়াহর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো স্পষ্ট করার ভিত্তিতে।

সমসাময়িক বুদ্ধিবৃত্তিক মানব সব সময় বিভিন্ন বিষয়ের সুশৃঙ্খল বাস্তব ব্যবস্থাপনা অনুসন্ধান করে। এ বুদ্ধিগত মনোবৃত্তি চেষ্টা করে এমন একটি ম্যাথডোলজি অনুসরণ ও কার্যকর করতে যার বিভিন্ন দিক পরিপূর্ণ। এ ম্যাথডোলজির মাধ্যমেই

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, আলোচনা, সমালোচনা ও পর্যালোচনা হবে। কুরআন সুন্নাহ এবং বিশ্বজনীন ও আঞ্চলিক পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে চিন্তাধারাগত আন্দোলনের এটাই হবে বাস্তবভিত্তিক মডেল বা ছাঁচ। এ ম্যাথডোলজির মাধ্যমেই কুরআন মজিদের লক্ষ্যসমূহে পৌছা যাবে, সুন্নতে নববী অনুধাবন করা যাবে। তখন কেউ অতীত বন্ধ্যাত্বের আশ্রয় নেয়া বা বাতেনি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার কাজে নিপতিত হবে না। অথবা কেউ নিপতিত হবে না এমন নব নব সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাতেও যা অতীতের আদলে জোড়াতালি দেয়ার নামান্তর হবে কিংবা অতীতে যেভাবে কোনো কিছু বাস্তবায়ন করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হবে বর্তমান কালে এর ফলাফল অর্জন করার জন্য। এ যেন অতীতকে নতুন বেশে ভূষিত করা মাত্র। না, কুরআন সুন্নাহর পদ্ধতি বিজ্ঞান অনুসরণ করতে পারলে, এসবের দরকার হবে না।

পাঁচ

আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ইসলামি ঐতিহ্য তথা জ্ঞানভাণ্ডার অধ্যয়ন ও অনুধাবন কাজটিও পুনর্গঠন করতে হবে। এগুলো জ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, যাচাই বাছাই, সমালোচনা, পর্যালোচনামূলক পাঠ করতে হবে। এর মাধ্যমেই আমরা তিনটি চক্র বা বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারব। যে তিনটি চক্র আধুনিককালে আমাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে আচরণবিধি নিয়ন্ত্রণ করছে। এ তিনটি চক্র হলো : অতীত উত্তরাধিকার ভাণ্ডারের সব কিছু প্রত্যাখ্যানকারী চক্র, সব কিছু গ্রহণকারীচক্র, ম্যাথডোলজি ব্যতিরেকেই বাছাই করে চলার চক্র। আমাদের উত্তরাধিকার জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে যথাযথ আচরণ করার ক্ষেত্রে এ তিন চক্রের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছা সম্ভব নয়। এমনিভাবে এ ভাণ্ডার থেকে যেসব ক্ষেত্রের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন, তা ঐ তিনচক্রের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

ছয়

সমসাময়িক মানবসমাজে বিরাজমান উত্তরাধিকার সম্পদ জ্ঞানভাণ্ডার তথা পশ্চিমা উত্তরাধিকার জ্ঞানভাণ্ডার ব্যবহার পদ্ধতিও পুনর্গঠন করতে হবে। এমনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে, যেন এর মাধ্যমে বর্তমানে অনুসৃত আচরণ পদ্ধতিগুলো থেকে মুসলিম মানস বের হয়ে আসতে পারে। বর্তমানের এসব পদ্ধতি বিভিন্ন দিক দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানোর পরিবর্তে মুসলমানদের পশ্চাতে ঠেলে দিচ্ছে।

www.pathagar.com

কারণ এ প্রচেষ্টাগুলো হওয়া দরকার ছিল পশ্চিমা উত্তরাধিকার সম্পদকে কাছে নিয়ে এসে নিবিড় করা, অতঃপর তুলনা করা, তারপর পরস্পর মুখোমুখি করা। কিন্তু তা না করার কারণে যা হওয়ার তাই হয়েছে। পরিণতিতে হয় সবকিছু প্রত্যাখ্যান, না হয় বিনা বাক্যে সব কিছু গ্রহণ অথবা পক্ষে বিপক্ষে না গিয়েই অন্ধভাবে বাছাই করা হয়।

এ ৬টি পদক্ষেপ বা অক্ষ বলয় বা দায়িত্ব যাই বলি না কেন -এগুলোকেই বলা হয় জ্ঞানের ইসলামিকরণ (Islamization of knowlegde) বা জ্ঞানের তাওহিদভিত্তিক পদ্ধতি (Unity of Allah Based Mathod of Knowlegde) বা মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর ইসলামিকরণ (Islamization of Humanities and Social Sciences) এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলোকে ইসলামি দিকনির্দেশনা প্রদান অথবা বিজ্ঞানগুলোকে ইসলামি ভিত্তিমূলে প্রতিস্থাপন[১১]।

কিন্তু বর্তমানে আমরা যে বিশ্বজনীন অবস্থার সম্মুখীন তাতে জ্ঞানবিজ্ঞান এবং তার বিভিন্ন আবিষ্কার ও উপকরণগুলো এমনভাবে ব্যবহার করা হয়, যা সৃষ্টিকর্তা, মহাবিশ্ব ও মানুষের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিচ্ছে। ছিন্ন করার পন্থা হলো : তারা সৃষ্টি জগত সম্পর্কে এমন সব ধ্যানধারণা ছেড়ে দেয়, যার কিছু কিছু আমাদের ইসলামি ধ্যানধারণার বিরোধী। তবে প্রকৃত পক্ষে কখনো কখনো বিরোধী হতে পারে, আবার কখনো কখনো বিরোধী নাও হতে পারে। মূল বিষয় কিন্তু এ নয় যে, আমাদের ধর্মীয় বক্তব্য হিসেবে ঐসব ধ্যানধারণায় যা আছে, তার সম্পর্কে আমরা বলে দিলাম যে, হ্যাঁ, এসব পূর্বে থেকেই আমাদের ছিল, কিংবা তা প্রত্যাখ্যান করলাম এবং যুক্তি প্রমাণ দিয়ে এগুলোকে কুফুরি বলে ফতওয়া দিয়ে দিলাম। কিন্তু প্রাকৃতিক জ্ঞানবিজ্ঞানের ব্যাপারে মূলত আমাদের চলার পন্থাটি ঈশ্বরতন্ত্র বা যাজকতন্ত্রের মতো নয়। আর আমাদের পক্ষে কাঙ্ক্ষিতও নয় যে, এ পথে আমরা অন্যদের অনুকরণ করে যাবো। জ্ঞানবিজ্ঞান ও এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন আবিষ্কারগুলো প্রতিরোধে তাদের অভিজ্ঞতা আমাদের অভিজ্ঞতার চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের যাজকগণ যেভাবে তা প্রতিরোধ করেছে, মুসলিম সমাজে সে রূপ কিছু দেখা যায়নি।

---

[১১] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য আমার রচিত Islamization of Knowlegde : Past and Present গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

আর আল কুরআন যদি ঈশ্বরতন্ত্রের মতোই হতো, তা হলে শুধু এ গ্রন্থটির একটি দিক পাঠ করতে বলা হতো। অর্থাৎ জীবন জগতের দিকে না তাকিয়ে শুধু প্রথম পাঠ তথা কিতাবি জ্ঞান পাঠ করার কথাই বলা হতো। কিন্তু আল কুরআন এ ক্ষেত্রে আমাদের ভিন্ন নির্দেশ দিয়েছে। কিতাবি জ্ঞান অধ্যয়নের সাথে সাথে মহাবিশ্ব অধ্যয়ন করতেও বলা হয়েছে। তাই আমরা বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হই না। কারণ আমরা জানি, এ গ্রন্থে যে ওহিজ্ঞান আছে, প্রকৃতি জগতের জ্ঞানও এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে উভয় প্রকার জ্ঞান অধ্যয়নের পৃথক পৃথক কৌশল ও পদ্ধতি রয়েছে। বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে কোনো বিচ্যুতি দেখা দিলে, তা সংশোধন করাই বাঞ্ছনীয়। অপরদিকে ওহিজ্ঞানের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে কোনো বিচ্যুতি দেখা দিলে সে ক্ষেত্রে তা প্রত্যাহার করে সেই ওহির ভাষ্য তথা নস হেফাজত করতে হবে। উভয় ধরনের অধ্যয়নের মধে সমন্বয় সাধনের এটাই ভিত্তি।

এ দ্বীন (ইসলাম) পূর্বে কখনো বিজ্ঞান চর্চাকে মোকাবেলা করেনি। মোকাবেলা যতটুকু করেছে, তা শুধু মাত্র বুদ্ধিনির্ভর (মুতাজিলী) চিন্তাধারার বিরুদ্ধে। বর্তমানকালের ফলিত বিজ্ঞান ও তার ফলাফল দ্বারাও অতীতে ঐ দ্বীন অস্ত্রসজ্জিত ছিল না। যে ধরনের ফলাফলের পরিণতিতে এমন সব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা ঐতিহ্যগত স্থিতাবস্থা অতিক্রম করেছে। সুতরাং আমরা যেভাবে আদিষ্ট, আমাদের কর্তব্য হলো, বিজ্ঞানকে ঐ সব মতবাদের করাল গ্রাস থেকে উদ্ধার করা, তার আপন অবস্থানে ফিরিয়ে আনা, একে পবিত্র করা, তার ব্যবহার পুনর্গঠন করা। এমনিভাবে কুরআন সুন্নাহের নস বা ভাষ্যের খেদমতে নিয়োজিত জ্ঞানবিজ্ঞানসমূহে যেসব অতিরঞ্জিত বিষয় সন্নিবেশিত বা সংযোজন করা হয় তা থেকেও পরিশীলন করা। যেন পাঠ বা অধ্যয়ন কাজটি যথাযথ ও সঠিক হয় এবং উভয় ধরনের অধ্যয়নের মাঝে সমন্বয় করার সম্ভাবনাগুলো বাস্তবে রূপ লাভ করে।

জ্ঞান ইসলামিকরণ ও সমন্বয় সাধনের মিশন কুরআনিক ও বিশ্বজনীন

ওহিজ্ঞান ও মহাবিশ্ব অধ্যয়নের মাঝে সমন্বয় সাধনের মিশন (যা রূপায়িত হয় জ্ঞান ইসলামিকরণ হিসেবে) একটি বিশ্বজনীন মিশন। কেউ কেউ হয়তো ধারণা করে যে, এটি একটি বিশেষ অঞ্চলের বা বিশেষ জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু বাস্তবে এটি নির্দিষ্ট কোন ভূখণ্ড বা জনগোষ্ঠীর জন্য মিশন নয়। গোটা বিশ্বের মানবগোষ্ঠীর জন্য এটি প্রয়োজনীয়।

www.pathagar.com

আমরা বর্তমান বিশ্বের একটি মিথস্ক্রিয়াশীল অংশ। বিশ্বে আমাদের এ অবস্থানটি সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে তৈরি হয়নি। এ ধরনের আগ্রাসন তো খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের সাথে আমাদের মিথস্ক্রিয়াটি সম্পাদিত হচ্ছে ফলিত বিজ্ঞান জগত আক্রমণ করার মাধ্যমে। এখানে ইসলামিকরণ কর্মে আমাদের তেমনি শ্রম দিতে হবে, যেমনি শ্রম দিয়ে ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষগণ চিন্তাধারা ও বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন মোকাবেলায়। যে আগ্রাসনটি আমাদের দরজার কড়া নেড়েছিল ফ্রান্স বিপণ্ডবের সাথে সাথে। তখন আমরা শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানে থেকে এবং সীমিত বুদ্ধিবৃত্তিক মানবিয় সামর্থ্যে পরিস্থিতি মোকাবেলা করছিলাম। আর আজ আমরা বাস্তববাদী বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তির সম্মুখীন। যে ইতোমধ্যে মানবিক ও প্রাকৃতিক জ্ঞানবিজ্ঞানের একটি ফ্রেম পুনর্গঠন করে ফেলেছে। এখন আমাদের সামনে যে সব পথ খোলা, তন্মধ্যে হয় আমরা অক্ষম ঈশ্বরীয় যাজকতন্ত্রীদের মত আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করব, যা কাঙ্ক্ষিত নয়, নতুবা আমাদের সমসাময়িক সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক অবকাঠামো খুলে ধরে এর প্রাকৃতিক ও মানবিক জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখা-প্রশাখা ইসলামিকরণে নিবিষ্ট হবো। তবে এ কাজটি হতে হবে কুরআনের মহাবিশ্বজনীন ও সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। এসব ফলিত বিজ্ঞানসমূহ বিছিন্ন অবস্থায় খণ্ডিত মাত্রায় পথ চলছে। এগুলো মহাবিশ্ব চরাচরের সামগ্রিক মাত্রায় সন্নিবেশিত হয়নি। আর সৃষ্টিজগতের সম্যক মাত্রাটি কুরআনিক ওহিজ্ঞানে লুকায়িত আছে। যেখানে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ . لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

যারা নিজেদের নিকট কোনো দলিল না থাকলেও আল্লাহ তায়ালার নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, এদের অন্তরে আছে কেবল অহঙ্কার, যা সফল হওয়ার নয়। অতএব, আল্লাহ তায়ালার শরণাপন্ন হন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। মানুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো কঠিনতর। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না (সুরা গাফির : ৫৬-৫৭)।

আর ঐ মিশনটি বিশ্বজনীন হওয়ার সাথে সাথে এটি কুরআনিক মিশনও বটে। আজ ধর্মগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব, বিশ্বসভ্যতার সুবিন্যস্ত কাঠামোর দৈন্যতা, নবুওয়াতের

www.pathagar.com

ধারাক্রম পরিসমাপ্তি এবং চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে সংকটসমূহের প্রেক্ষাপটে একমাত্র আল কুরআনই সদর্পে ব্যাপক সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে। কেননা এটাই একমাত্র ওহি গ্রন্থ। তাই যেখানে যখন অন্যরা থেমে যায়, তখনো আল কুরআন তার দান অব্যাহত রাখে।

আল কুরআনের এ সংগ্রামটি আমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। পরীক্ষাটি হলো : উভয় ধরনের অধ্যয়নের সমন্বয়ের মাধ্যমে আমরা কতটুকু আল কুরআনের পদ্ধতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ও শিক্ষাব্যবস্থার ওপর আমরা কতটুকু সভ্যতাগত প্রভাববিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছি, তা তলিয়ে দেখার জন্য।

সমসাময়িক বিজ্ঞানসমূহ আজকে এমন পর্যায়ে উপনীত, যেখানে প্রকৃতি পরিবেশের দুয়ার খুলে ক্ষুদ্রতায় অণু পরমাণুর অসীম সীমায় পৌছে গেছে এবং মহাসৃষ্টিজগতের অন্তঃহীন বিশালতায় বিচরণ করছে। এখানে প্রকৃতি জগতকে সেভাবে দেখা হচ্ছে না, যেমনিভাবে বাহ্য চোখে দেখেছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষগণ। আগে যেমনিভাবে পঞ্চইন্দ্রিয় ছিল জ্ঞানের উৎস, আজকে এর সাথে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়া জ্ঞানের পরিধিকে করেছে ব্যাপকভাবে প্রসারিত। এগুলো আজকে প্রকৃতি জগত সম্পর্কে নতুন নতুন জ্ঞান প্রদান করছে। পূর্বেকার লোকজন অণু পরমাণু বলতে যেখানে বুঝত বালুর দৃশ্যমান সূক্ষ্মতা, কিন্তু আজকের অণু একমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই দর্শনীয়। যা আজকে অণু এর অবস্থানকে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান অবস্থায় নিয়ে গিয়েছে। সৃষ্টি জগতও কিছু দৃশ মান, অনেক কিছু অদৃশ্যমান। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ

আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও, আর যা দেখতে পাও না[১২]।

পূর্বেকার ইতিহাসবিদগণ ইতিহাসের ধাপগুলো বলতে বুঝতেন, এগুলো পরম্পরা ও পুনঃপ্রত্যাবর্তনকারী ধাপ হিসেবে। কিন্তু আজকে ইতিহাসের ঐ ধাপগুলোকে বলা হচ্ছে অবস্থাগত, গুণমান ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন হিসেবে। এগুলো শুধু পরিমাণগত

[১২] সূরা আল হাক্কা : ৩৮-৩৯।

www.pathagar.com

পরিবর্তন হিসেবে নয়[১৩]। আর এটাই হলো সমসাময়িক কালের বৈজ্ঞানিক কার্যকারণগত পার্থক্য। তাই সমসাময়িক কার্যকারণ হলো : সর্বাগ্রে অবস্থাগত পরিবর্তন এবং গুণমান ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন।

জ্ঞান ইসলামিকরণ ও মানবতার সর্বশেষ গন্তব্য

জ্ঞান ইসলামিকরণ বিষয়টি কোন চিন্তাগত বিলাসিতা কিংবা ঝগড়া বিবাদপূর্ণ দার্শনিক বিতর্ক নয়। কেননা যখন উভয় ধরনের অধ্যয়নের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হলো, তখন এর লক্ষ্য হলো মানব চিন্তাধারাকে মুক্ত করা। ঈশ্বরতন্ত্রে উজ্জীবিত যাজকদের তৈরি সংকট থেকে তাদের মুক্ত করা। যে যাজকতন্ত্র মানুষ ও সৃষ্টিজগতের স্বাভাবিক অবস্থান ও গতি প্রকৃতি ছিনিয়ে নিয়েছিল।

এ ছাড়া, সেই সাথে ঐ কাজের আরেকটি লক্ষ্য হলো বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা দখল করে বসা বাস্তববাদী মতবাদ (Realism)-এর খপ্পর থেকে মানুষকে বের করে আনা। যে মতবাদটি বিজ্ঞান ও সৃষ্টিকর্তার মধ্যে সম্পর্কের ফাটল সৃষ্টি করেছে।

আর মানুষের জীবন, তাদের সভ্যতার বিন্যাস কাঠামো, তাদের জীবন চলার মূলনীতি ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত দুই ধরনের ম্যাথডোলজিরই প্রভাব রয়েছে। তাই এ দুই ধরনের ম্যাথডোলজি থেকে মুক্ত হতে হলে বিকল্প থাকা চাই।

---

[১৩] ইতিহাসের স্তর বা ধাপসমূহকে ঘটনার পরম্পরা ও পুনঃপ্রত্যাবর্তন হিসেবে ধরলে এটা বন্ধ্যাত্বে আক্রান্ত এক ধরনের চিন্তাগত তুষ্টির পর্যায়ে পর্যবশিত হবে। যে দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় যে, ঘটনাবলি পুনঃ পুনঃ এমন এক চক্রাবর্তে ঘটছে, এর জন্য পুনঃ পুনঃ একই সমাধান পেশ করা সম্ভব। যে কোনো পর্যায়ে ও অবস্থায় সে সমাধানগুলো উদ্ভাবিত হোক না কেন। এ সমাধান সমভাবে সব যুগেই কার্যকর। কিন্তু ইতিহাসের স্তরগুলো অবস্থার পরিবর্তন, পরিণতিজনিত ঘটনা এবং গুণমান ও পদ্ধতিগত পরিবর্তন বলে যে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ গড়ে উঠে, তাতে ধরে নেয়া হয়, মানব মন মানস অনবরত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে। যার জন্য নতুন নতুন সমাধান পেশ করা প্রয়োজন হয়। আর এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অনবরত একটি নস মুতলাক তথা স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের দ্বারস্থ হতে হয়। আর তাহলো একমাত্র আল কুরআনুল করিম। বিশেষ করে মুসলমান হিসেবে বলতে গেলে আমরা এহেন প্রেক্ষাপটে অবস্থাগত পরিবর্তন ও পরিণতিগত চিন্তাধারাগুলো উপস্থাপন করব এবং আল কুরআনের সাথে সদা সম্পৃক্ত থাকতে বলব। কারণ এ মহাগ্রন্থ আল কুরআনই সদা নতুন নতুন সমাধান দিয়ে সহযোগিতা করতে পারে।

www.pathagar.com

সুতরাং ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করলে দেখা যাবে, জ্ঞান ইসলামিকরণ বিষয়টি হলো : বিশ্বজনীন সভ্যতার বিকল্পর অগ্রজ পদক্ষেপ বা প্রারম্ভিকা স্বরূপ। ইসলামিকরণের মিশন শুধু মুসলমানদের জন্য পরিচালিত নয়। বরং গোটা বিশ্ব সংস্কার করার লক্ষ্যে এ মিশন নিবেদিত। মিশন চালাতে হলে বেশ সংখ্যক এক্সট্রাঅর্ডিনারি তথা অসাধারণ মেধাপ্রসূত উন্নতমানের গবেষণা হওয়া দরকার। যে গবেষণা চলবে স্বয়ং আল কুরআনে। এ গবেষণা চলবে নবচেতনায় বা নব উপলব্ধিতে এবং বৈজ্ঞানিক ও বিশ্বজনীনভাবে স্বীকৃত পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে। আর এটাই হলো জ্ঞান ইসলামিকরণের মৌলিক মিশন।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, আল কুরআনের পদ্ধতিগত স্টাডি ব্যতীত জ্ঞান ইসলামিকরণ কাজটি অসম্ভব। এ মহাগ্রন্থের পদ্ধতিগত স্টাডি করতে হবে তার একক স্থাপনা ও পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদি কাঠামো অনুসারে। যে স্টাডিটি সম্পৃক্ত হবে এবং প্রতিফলন ঘটাবে আমাদের সমসাময়িক পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক স্টাডির ওপর। যে বৈজ্ঞানিক স্টাডি পরিচালিত হয়ে থাকে প্রকৃতি পরিবেশ ও এর একক বুনিয়াদি স্থাপনায় চলনের নিয়মনীতির ওপর। সুতরাং বিশ্বের বর্তমান ম্যাথডোলজির অবস্থা হলো, তা আধিক্যকে এককের দিকে ফিরিয়ে দেয়। বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক এবং সেসব সম্পর্কের মাঝে গ্রোথিত নিয়ম বা তার অন্তরালে স্থিত নিয়মকানুনে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রকৃতি পরিবেশ বিচার-বিশ্লেষণ করে থাকে। শুধু এর একটি ব্যাখ্যা দেয়াকেই যথেষ্ট মনে করে না। আর মহামহিম গ্রন্থ আল কুরআনুল কারীমও তার পূর্ণাঙ্গ বুনিয়াদি কাঠামোতে ঐ ধরনের ম্যাথডোলজিভিত্তিক স্টাডি চালানোর উপযুক্ত। আর এটা এভাবে যে, আমরা একে সে ম্যাথডোলজিতেই স্টাডি করব, যেভাবে বৈজ্ঞানিকগণ মহাবিশ্ব স্টাডি করে থাকে, যা আমি আগেও বলেছি যে, তা করতে হবে, বিশ্বজনীন ও বৈজ্ঞানিক মানসে।

সন্দেহ নেই যে, এখানে একটি সমস্যা বা সংকট রয়েছে। কিন্তু তা অতিক্রম করতে হবে এবং এ থেকে উত্তরণ লাভ করতে হবে। সে সমস্যাটি হলো : সমসাময়িক বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মানস এককথায় সব ধর্মীয় কিতাব বর্জন করে থাকে। যদিও এসবের কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে নমনীয় ভাব প্রদর্শন করে। তবুও এসব গ্রন্থের ম্যাথডোলজি, বুনিয়াদি স্থাপনাগত এককত্ব, চূড়ান্ত কাঠামোকে তারা প্রত্যাখ্যান করে। তারা জোর দিয়েই বলে থাকে যে, এসব ধর্মীয় গ্রন্থের ক্ষেত্র বিশ্বাসগত তুষ্টি ও অদৃশ্যমান জগত পর্যন্ত সীমিত থাকা উচিত। অনন্তর ঐ দাম্ভিকদের মতে

www.pathagar.com

অদৃশ্যজগত ও বাস্তবতার মাঝে সমন্বিত অধ্যয়ন করা অসম্ভব। তারা বলে থাকে, এ ধর্মীয় গ্রন্থগুলো যে সব গায়েবি বা অদৃশ্য জগত সম্পর্কে কথাবার্তা আছে, তা তো বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার উপযুক্ত ক্ষেত্র হতে পারে না। যদি তাই করা হয়, তা হলে এর যে কোনো একটিকে অবান্তর ঘোষণা করতে হবে অথবা জোড়াতালিমূলক সমঝোতা করতে হবে ও সমাধানে আসতে হবে। তাদের মতে, আসমানি কিতাবগুলো অদৃশ্যজগত সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়ে থাকে বা কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করে, তা সমসাময়িককালের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষার আয়ত্তাধীন নয়। এ বিষয়ে গবেষণাকে বৈজ্ঞানিক মর্যাদা দেয়া যাবে না। এ জন্য বর্তমান বিশ্বের জন্য ইউনেসকো জ্ঞানের একটি সংজ্ঞা পরিবেশন করেছে। তার ঘোষণায় বলা হয় : যে জ্ঞাত বিষয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ তাই জ্ঞান।

উপরে যে বক্তব্য দেয়া হলো নিঃসন্দেহে তা একটি ভুল ধারণা থেকে উদ্ভূত। যেখানে দুটি পাঠ তথা আল কুরআন ও মহাবিশ্বের সমন্বিত অধ্যয়নের বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়নি। এ সমন্বয়ের উদ্দেশ্য হলো এ অস্তিত্বশীল সৃষ্টি জগতের মহাবিশ্বজনীন বা সার্বজনীন অধ্যয়ন প্রক্রিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া, যা শুধু এককভাবে মহাবিশ্ব অধ্যয়ন করার মধ্যেই সীমিত হয় না। জগতে আরো অনেক কিছু আছে, যা শুধু দৃশ্যমান পরিবেশ অধ্যয়নে অর্জিত হয় না। যদি দ্বিতীয় প্রকারের অধ্যয়ন তথা মহাবিশ্ব অধ্যয়নই যথেষ্ট মনে করি, তা হলে অচিরেই আমরা সৃষ্টিজগত সম্পর্কে বাস্তববাদীদের মতো চিন্তাধারার পরিমণ্ডল ও কথাবার্তা পর্যন্ত থেমে যাব। এর বেশি অগ্রসর হতে পারব না। আমরা এমন একটি ধারণাই চর্চা করব, যার ভিত্তি হবে সমসাময়িক কালের বৈজ্ঞানিক তর্ক বিবাদের ভিত্তিতে প্রকৃতি পরিবেশের দ্বার উন্মোচন প্রচেষ্টা ও বিভক্তীকরণের ওপর এবং এর সম্ভাবনা ও আপেক্ষিকতা বের করার ওপর। আর এখানেই দ্বিতীয় প্রকার তথা মহাবিশ্বের পৃথক অধ্যয়নের মন্দ দিকগুলো প্রকাশ পাবে অথবা শেষ পরিণতিতে আমাদের বিচ্ছিন্ন ও আংশিক বাস্তববাদী চিন্তাধারার দিকে ধাবিত করবে। মহাবিশ্বজনীন বা সার্বজনীন চিন্তাধারার দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাবে না।

অপরদিকে আমরা যদি দ্বিতীয় প্রকারের সে অধ্যয়নটিকে প্রথমটি তথা আল কুরআন অধ্যয়নের সাথে সমন্বয় করি, তখন ক্রমান্বয়ে আমরা জুযঈ বা আংশিক ও সীমিত বাস্তববাদিতা থেকে মহাবিশ্বজনীন কুল্লি বা সামগ্রিকতার দিকে অগ্রসর হবো।

www.pathagar.com

যেখানে রয়েছে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান পরিবেশ। গায়েবি ও অতিন্দ্রিয় বিষয় অস্বীকার করা মানে প্রথম পাঠ বা অধ্যয়নটিকে অস্বীকার করা।

সুতরাং ওহিজ্ঞানগুলোতে মহাবিশ্বজনীন অধ্যয়ন হবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার নামে। ওহিজ্ঞান হলো এমন একটি সার্বজনীন সামগ্রিক জ্ঞান, যা বিভিন্ন অংশে বিভাজিত জ্ঞানগুলো আওতাভুক্ত করে। আর এ প্রথম পাঠ বা ওহিজ্ঞান অধ্যয়নটি তার ম্যাথডোলজিতে সব গায়েবি ও অতিন্দ্রিয় বিষয়গুলো অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই বিবেচনায় নিবে। এসব পূর্বগৃহীত ও শুধু বিশ্বাসযোগ্য বিষয় হিসেবে কখনো বিবেচনা করে না। দ্বিতীয় পাঠ তথা মহাবিশ্ব অধ্যয়ন যে জগতের সন্ধান দেয়, তার চেয়ে আরো বিশাল জগতের সন্ধানদাতা হিসেবে সে গায়েবি সংবাদসমূহকে বিবেচনা করে। আর এভাবেই এ সৃষ্টিজগতের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব। তাই গায়েবি বিষয় দূরে রাখার অর্থ প্রথম পাঠ তথা কুরআন অধ্যয়ন থেকে দূরে থাকা। কোনো গবেষণায় হোক বা যে কোনো সমস্যা সমাধানে হোক, এ অধ্যয়নের মধ্যে আমরা দেখতে পাই, এটি গোটা সৃষ্টিজগত ও মহাবিশ্ব সম্পর্কে সঠিক সন্ধান দিচ্ছে। এগুলো পূর্বেকার মানবসমাজে প্রচলিত শ্রুত উপাখ্যান নয়। যেমনটি কেউ কেউ অমূলক ধারণা করে থাকে। বরং এগুলোর বাস্তবতায় যথেষ্ট পরিমাণ দলিল রয়েছে, যা দ্বারা এসব প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত বিষয়। যদি এসব আমরা গ্রহণ না করি, তাহলে আমরা ফিরে যাবো ঐ বাস্তববাদ প্রভাবিত নিরেট প্রকৃতিজগত অধ্যয়ন ক্ষেত্রে। তখন আমরা মহাবিশ্বের প্রকৃত অবস্থা জানার ধারে কাছেও পৌছতে পারব না।

প্রথম পাঠ তথা আল কুরআন অধ্যয়ন শুধু আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব বিশ্বাস করাকেই যথেষ্ট মনে করে না। বরং এ সৃষ্টি জগত ও মহাবিশ্বের মাবুদ সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। যেমনিভাবে এ গ্রন্থ এ গোটা সৃষ্টজগত ও সৃষ্টিজগতে মানুষের শেষ গন্তব্যস্থলের দিকনির্দেশনাও প্রদান করে থাকে। এর অর্থ সৃষ্টিজগতে সৃষ্টিকর্তার ম্যাথডোলজি বাস্তবে বিরাজমান সব কিছুর ম্যাথডোলজিকে আওতাভুক্ত করে। যা আমরা কলমের সুবাধে অধ্যয়ন করে থাকি।

অতএব, সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির ম্যাথডোলজি এবং মহাবিশ্ব অধ্যয়নে কলম বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুর যে ম্যাথডোলজি পর্যবেক্ষণ ও লিপিবদ্ধ করে তার মাঝে আমরা সমন্বয় সাধন করব। এভাবে ইমান তার পূর্ণাঙ্গ ও সামগ্রিক রূপ

www.pathagar.com

নিবে। অন্যথায় ম্যাথডোলজি বলতে শুধু কিছু বাছাইকৃত কাগজপত্র বুঝাবে, যা শুধু এক পক্ষ নিয়ে প্রথম পাঠের পরিবর্তে দ্বিতীয় পাঠের প্রতিই ঝুঁকে যাবে।

বর্তমান বিশ্বের মানস ও সভ্যতাগত সংকট থেকে উত্তরণ লাভ করতে হলে মহাবিশ্বের গায়েবি দিকটিও অনুধাবন করতে হবে। যে দিকটিও সৃষ্টিজগত গড়া ও তার চলার পথ নিরূপণে ভূমিকা রাখছে। এটাই হলো প্রথম পাঠের ভূমিকা। কারো কারো কাছে বৈজ্ঞানিক বৃত্ত থেকে যাকে দূরে রাখা প্রয়োজন বলে মনে হয়।

মোটকথা, এ কর্তব্য ও মিশনটি বিশাল বড়। আর এ ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটি বিরাটকায়। এর বিশালতা এ মহাবিশ্বের প্রসারতার সাথে প্রসারিত। এ মিশনটি শুরু উভয় ধরনের অধ্যয়নের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে। এর উদ্দেশ্য জ্ঞান ইসলামীকরণ। যেন সঠিক দিকনির্দেশনা সর্বব্যাপী রূপ নেয়। সত্য বিজয়ী বেশে প্রচলিত হয়। হেদায়েতের বাণী প্রসারিত হয়। ইমান ও আল কুরআনের নূরে পৃথিবী হয়ে যায় আলোকময়। আমাদের পথে বাধা আছে। কিন্তু সদা গঠনমূলক বিজ্ঞানসম্মত সংলাপের মাধ্যমে এবং যথাযথ ম্যাথডোলজি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের পথ থেকে সে বাধা অপসারিত হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা কুরআনিক জ্ঞানের ম্যাথডোলজি ব্যবহার করলে তার বিভিন্ন দিক স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং ওলামা ও গবেষকগণও এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত ও পরিতৃপ্ত হতে পারবেন।

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ يوسف: ٢١

আল্লাহ তায়ালা তার মিশনে তথা কার্যসম্পাদনে অপ্রতিহত, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়[১৪]।

[১৪] সূরা ইউসুফ : ২১- অনুবাদক।

www.pathagar.com

এ বই প্রসংগে

জ্ঞান ইসলামিকরণ ধারণাটি স্পষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা জ্ঞান ও সভ্যতা বিনির্মাণগত। যা শুধু ইসলামের স্বার্থে নয় বরং গোটা বিশ্ব সমাজের জন্য প্রয়োজন। মানব সমাজে জ্ঞানগত বিভ্রান্তি, এমনকি সমসাময়িক চিন্তা ও মানস সংকট-উত্তরণের লক্ষ্যে এর প্রয়োজনীয়তা তীব্রতর।

জ্ঞান ইসলামিকরণের কাজটি দু'ধরনের অধ্যয়নের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়। একটি হলো ওহি গ্রন্থ (আল কুরআন) অধ্যয়ন, অপরটি হলো বিশ্বচরাচর তথা প্রাকৃতিক জগত অধ্যয়নের মাধ্যমে। এ উভয়টিই পরস্পরের জন্য বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যের সন্ধানদাতা, দলীল প্রমাণ ও নির্দেশিকা স্বরূপ। আল কুরআনে সৃষ্টি জগতের যেসব নিয়ম শৃঙ্খলার কথা বলা হয়েছে, বাস্তবেও তাই প্রমাণিত হচ্ছে, বিশ্বচরাচরে তা-ই প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। মহাবিশ্ব জগতে যা ঘটছে বা হচ্ছে কিংবা ঘটতে যাচ্ছে, তা আল কুরআনে বলে দেয়া হয়েছে। তাই এ দুটো জ্ঞানের উৎসকে বিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন করলে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জিত হবে না। উভয়টিকেই পাশাপাশি নিয়ে অধ্যয়ন করতে হবে। এটাকেই বলা যায়, আল কুরআন ও মহাবিশ্বের সমন্বিত ধারায় অধ্যয়ন।

যারা শুধু আল কুরআন অধ্যয়ন করবে, তারা বাস্তবতা সম্পর্কে সীমিত জ্ঞানের অধিকারী হবে। অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যার সমাধান দিতে পারবে না। তাদের চিন্তাধারায় বন্ধ্যাত্ব বিরাজমান করবে। আর যারা শুধু প্রাকৃতিক নিয়মাবলী অধ্যয়ন করবে, তারা সৃষ্টিকর্তার মহিমা ও কার্যাবলীর রহস্য বুঝতে পারবে না এবং বাস্তবতার ধুয়া তুলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হবে। তারা সমস্যা সমাধান করতে যেয়ে বিপর্যয় ডেকে আনবে।

তাই প্রয়োজন এ দুটি উৎসকে সমন্বিত ধারায় অধ্যয়ন করা। এরমধ্যেই জ্ঞান ইসলামিকরণের প্রত্যয়টি নিহিত। জ্ঞানগত ব্যবস্থার কাঠামো বিনির্মাণে এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও ক্ষেত্রের সাথে সঠিক আচরণ ও ব্যবহার বিধি নিরূপণে এবং এসব ক্ষেত্রের মাঝে সুসমন্বয় বিধানে এ গ্রন্থটি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

লেখক পরিচিতি

প্রফেসর ড. ত্বাহা জাবির আল আলওয়ানী ১৯৩৫ সালে (১৩৫৪ হিজরিতে) ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। নিজ দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষে তিনি আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় কায়রোর 'শরিয়া ও আইন' কলেজ থেকে ১৯৫৯ সালে অনার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৬৮ সালে এম এ ডিগ্রী এবং ১৯৭৩ সালে উসূল-আল-ফিকাহ এর উপর পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

ড. আল আলওয়ানী প্রায় দশ বছর (১৯৭৫- ১৯৮৫) রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মদ ইবন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকাহ ও উসূল-আল-ফিকাহ'র প্রফেসর ছিলেন। তিনি International Institute of Islamic Thought (IIIT), USA-এর প্রতিষ্ঠা পর্বে যোগ দেন এবং পরবর্তীতে এর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মক্কাস্থ Council of the Muslim World League এর একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এছাড়া তিনি ১৯৮৭ সাল থেকে জেদ্দাস্থ OIC Islamic Fiqh Academy এর একজন সদস্য এবং ১৯৮৮ সালে Fiqh Council of North American এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বইসমূহের মধ্যে - Usul al Fiqh al Islami (Source Methodology in Islamic Jurisprudence), The Ethics of Disagreement in Islam এবং The Quran and the Sunnah : The Time Space Factor অন্যতম।

ISBN : 978-984-8471-31-9

9 789848 471319

www.pathagar.com